Reading Room Copy

Occasional Paper No. 32

রাঢ়ের ইতিহাস প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা

(A FEW OBSERVATIONS ON THE HISTORY OF RARH)

HITESRANJAN SANYAL

S/840.
G1

CENTRE FOR STUDIES IN SOCIAL SCIENCES, CALCUTTA

PUBLICATIONS OF
CENTRE FOR STUDIES IN SOCIAL SCIENCES, CALCUTTA

OCCASIONAL PAPER SERIES :

Mimeographed Occasional Papers for limited circulation for scholarly comments and critical evaluation of first drafts are meant for publication later in journals or books : reference to subsequent publication of each of the following Occasional Papers are given in brackets :

1. Iswarchandra Vidyasagar and his Elusive Milestones (Calcutta, Riddhi-India, 1977)

   ASOK SEN

2. Budget Deficit, Money Supply and Inflation *(The Contents of Economic Growth and Other Essays*, Calcutta, Research India Publications, 1977)

   BHABATOSH DATTA

3. Railway Network Growth in Eastern India, 1854-1910 *(International Geography*, Vol. VI, 1976)

   SUNIL MUNSI

4. Sasipada Banerjee : A Study in the Nature of the First Contact of the Bengali Bhadralok with the Working Classes of Bengal *(Indian Historical Review*, Vol. II, No. 2, January, 1976)

   DIPESH CHAKRABORTY

5. Reflections on Patterns of Regional Growth in India during the Period of British Rule *(Bengal Past and Present*, Vol. XCV, Part 1, No. 180, January-June, 1976)

   AMIYA KUMAR BAGCHI

6. Social Groups and Social Relations in the Town of Murshidabad, 1765-1793 *(Indian Historical Review*, Vol. 11, No. 2, January, 1976)

   GAUTAM BHADRA

7. Contemporary Studies on the Indian Party System : An Evaluative Account (*Socialist Perspective*, Vol. VI, No. 3, December, 1978 and Vol. VI, No. 4, March 1979)

   SOBHANLAL DATTA GUPTA

8. Studies in the Constitution and Government o India : A Methodological Survey *(Teaching Politics*, Vol. IV, No. 1-2, 1978)

   SHIBANI KINKAR CHAUBE

9. Demand for Electricity

   NIRMALA BANERJEE

10. Comintern and the Colonial Question : the Decolonisation Controversy *(Marxist Miscellany*, No. 8, 1977 and No. 11, 1978)

    SOBHANLAL DATTA GUPTA

11. Communal Riots and Labour : Bengal's Jute Mill Hands in the 1890s (forthcoming in *Past and Present*, Oxford)

    DIPESH CHAKRABORTY

12. An Enquiry into the Causes of the Sharp Increase in Agricultural Labourers in North Bengal (*Economic and Political Weekly*, Vol. XII, No. 53, December 31, 1977)

    NRIPENDRANATH BANDYOPADHYAY

13. Research Notes and Documents Collected by the Late Prodyot Mukherjee

    ARUN GHOSH, *comp.*

14. Choice of Techniques and Technological Development in Underdeveloped Countries : A Critique of the Non-Neoclassical Orthodoxy *(Cambridge Journal of Economics*, June, 1978)

    AMIYA KUMAR BAGCHI

OCCASIONAL PAPER NO. 32

রাঢ়ের ইতিহাস প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা

(A FEW OBSERVATIONS ON THE HISTORY OF RARH)

HITESRANJAN SANYAL

OCTOBER, 1980

CENTRE FOR STUDIES IN SOCIAL SCIENCES, CALCUTTA
10, LAKE TERRACE, CALCUTTA-700029.

S|840

Calcutta

গত বৎসর (১৯৭১) নভেম্বর মাসে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে "রাঢ় অঞ্চলের সমাজ ও সংস্কৃতি : গঠন ও রূপান্তর" সম্বন্ধে একটি আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমান প্রবন্ধটি এই আলোচনাচক্রের জন্য লেখা। আদি প্রবন্ধটির পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ এখানে ছাপা হচ্ছে।

যেতে পারে । বর্তমান শাসনতান্ত্রিক বিভাগ অনুযায়ী এর মধ্যে পড়বে বীরভূম জেলা, বর্ধমান জেলার উত্তরপশ্চিম অংশ, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলা ও মেদিনীপুর জেলার পশ্চিম অংশ । এর সঙ্গে ধরতে হবে দক্ষিণপশ্চিম বাংলার লাগোয়া ওড়িশা ও বিহারের সন্নিহিত কতকগুলো এলাকা, অর্থাৎ ময়ূরভঞ্জ জেলা (ওড়িশা) এবং সিংভূম, রাঁচী, ধানবাদ ও সাঁওতাল পরগণা জেলার (বিহার) পূর্ব অংশ ।

ঐতিহাসিক কালে ভৌগলিক ও রাজনৈতিক অর্থে রাঢ়ের সীমানা প্রসারিত হয়েছে । প্রসারিত সীমানা সাংস্কৃতিক কারণেও তাৎপর্যপূর্ণ । ব্যাপকতর অর্থে রাঢ় মেদিনীপুর জেলার পূর্ব অংশ বাদে দক্ষিণপশ্চিম বাংলার সবটা নিয়েই গঠিত । এর মধ্যে একদিকে রয়েছে মালভূমির প্রান্তবর্তী উচ্চভূমি, আর অন্যদিকে আছে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের অন্তর্ভুক্ত দক্ষিণপশ্চিম বাংলার পূর্বাংশ । রাঢ়ের প্রসার ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই হয়েছিল । ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, রাজনৈতিক প্রয়োজন, হিন্দু সমাজ ও সংস্কৃতির প্রসার হয়ত দুই অংশকে একত্রিত করেছিল । কিন্তু একত্রীকরণ কখনও সর্বাঙ্গীন হয় নি । ফলে রাঢ়ের আদি ও সংযোজিত অংশের মধ্যে বৈপরীত্য ও বৈষম্য থেকে গেছে । রাঢ়ের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা তাই দুই ভাবেই করা যায় — ব্যাপকতর অর্থে রাঢ়ের দুই অংশকে একত্রিত বলে ধরে নিয়ে অথবা দুই অংশকে পৃথকভাবে দেখে । আমার মনে হয়, রাঢ় নিয়ে যে আলোচনা চলছে তার পরিপ্রেক্ষিতে রাঢ়ের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে দুটো অংশকে পৃথকভাবে দেখাই সঙ্গত হবে । বর্তমান প্রবন্ধটি আমি রাঢ়ের আদি অংশ অর্থাৎ দক্ষিণপশ্চিম বাংলার পশ্চিম অংশ ও সন্নিহিত এলাকাগুলোর মধ্যেই আবদ্ধ রাখছি । এই প্রবন্ধে রাঢ় বলতে এই আদি অংশটাকেই বোঝান হয়েছে ।

২

রাঢ়ের সমাজ, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের আলোচনা আরম্ভ করতে হলে কয়েকটা কথা আগে বলে নেওয়া প্রয়োজন । রাঢ় লৌহ ও তাম্রের মত অত্যাবশ্যক ধাতুর উৎস । দ্বিতীয়তঃ, ঐতিহাসিক যুগে অনুর্বর, জঙ্গলময় উচ্চনীচ রাঢ়ভূমি চারদিক থেকেই স্থায়ী বসতিসম্পন্ন উর্বর ভূমি দ্বারা পরিবেষ্টিত । তৃতীয়তঃ, ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত তো বটেই, তার পরেও রাঢ় বাংলার গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের অন্যতম প্রধান প্রবেশ পথ বলে গণ্য হ'ত । পশ্চিমে উত্তর ভারত থেকে এবং দক্ষিণে ওড়িশা হয়ে দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের যোগাযোগ হ'ত রাঢ়ের মধ্য দিয়ে । পশ্চিম ও দক্ষিণ

থেকে রাজনৈতিক অধিকার বিস্তার, সার্থবাহ চলাচল হয়েছে রাঢ়ের পথ বেয়ে। উত্তর ও দক্ষিণ ভারত থেকে মার্গ সংস্কৃতির প্রভাবও এসেছে ওই পথেই।

উত্তরে বীরভূম থেকে দক্ষিণে ময়ূরভঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখন্ডের মধ্যে অনেক জায়গাতেই লোহা ও তামার আকর দেখতে পাওয়া যায়। স্বভাবতই এই সব জায়গায় লোহা ও তামা উৎপাদনের কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। উনবিংশ শতকের মধ্যকাল পর্যন্ত রাঢ় ছিল বাংলার লোহা ও তামার প্রধান উৎস। বিভিন্ন কেন্দ্রের মধ্যে বীরভূমের লোহা মহলও বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর এলাকায় উৎপন্ন উন্নতমানের লোহা ও ইস্পাত সারা বাংলায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল। জিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার বিশেষজ্ঞ ভ্যালেন্টিন বলের সময়ে/থেকে রাঢ়ে দেশীয় পদ্ধতিতে ধাতু নিস্কাশন ও ধাতু শিল্প সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায়। বাংলার ব-দ্বীপ অঞ্চলের স্থায়ীবসতিসম্পন্ন সমাজ দীর্ঘকাল চাষ-বাস, চারু ও কারু শিল্প যুদ্ধবিগ্রহ অর্থাৎ উৎপাদন ও সমাজব্যবস্থা চালু রাখবার প্রশ্নে অত্যাবশ্যক ধাতু লোহা ও তামার জন্যে রাঢ়ের মুখাপেক্ষী ছিল। বিহার ও ওড়িশার স্থায়ী বসতিসম্পন্ন সমাজের ক্ষেত্রেও এ কথা আংশিকভাবে প্রযোজ্য।

আগেই বলেছি রাঢ়ের অরণ্যময় উচ্চভূমি আদিবাসী কৌম জনগোষ্ঠীসমূহের বাসস্থান। কিন্তু এর চারদিক ঘিরে প্রসার লাভ করেছিল স্থায়ী/বসতি-ভিত্তিক আর্য সংস্কৃতি। পশ্চিমে মগধে আর্য সংস্কৃতির বিস্তার হয়েছে সবার আগে। তারপর প্রসার লাভ করেছে দক্ষিণে ওড়িশায় এবং পূর্বে ও উত্তরে অবস্থিত বাংলার গাঙ্গেয় ব-দ্বীপে। শুধুমাত্র খন্ডজাতি/অধ্যুষিত উচ্চভূমি হ'লে রাঢ় সম্পর্কে স্থায়ী বসতিসম্পন্ন সমাজের বিশেষ আগ্রহ থাকত না। কিন্তু অত্যাবশ্যক ধাতুর উৎসভূমি বলে স্থায়ীবসতিসম্পন্ন সমাজের দিক থেকে রাঢ়ে অনুপ্রবেশ করবার এবং রাঢ়/অঞ্চলটিকে নিয়ন্ত্রণ করবার প্রয়োজন ও আগ্রহ ছিল। সম্ভবতঃ এই কারণেই রাঢ়ের বনময় অনুর্বর ভূখন্ডে আর্য সংস্কৃতির ধারক ও বাহক স্থায়ীবসতিসম্পন্ন হিন্দু সমাজের অনুপ্রবেশ আরম্ভ হয়। এই সূত্রে হিন্দু সমাজ ব্যবস্থা এবং আর্য ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রভাব রাঢ়ে বিস্তার লাভ করতে থাকে। মনে হয় ধাতু সংগ্রহের প্রয়োজন ছিল বলে রাঢ়ে স্থায়ীবসতিসম্পন্ন সমাজের অনুপ্রবেশ কিছুটা দ্রুতগতিতে হয়ে থাকবে। আবার ধাতু উৎপাদন এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সুনিশ্চিত করবার উদ্দেশ্যে অনুপ্রবেশকারীরা রাঢ়ের আদিবাসী কৌম গোষ্ঠীসমূহের ওপর কিছুটা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করবার এবং তাদের সাংস্কৃতিক রূপান্তর ঘটাবার চেষ্টা করবে এও অসম্ভব নয়।

৩

তবুও রাঢ়ের সঙ্গে স্থায়ীবসতিসম্পন্ন সমাজের যোগাযোগ সব সময়েই সীমাবদ্ধ থেকে গেছে । রাঢ়ের সঙ্গে বাইরের স্থায়ীবসতিসম্পন্ন সমাজের সর্বপ্রথম যোগাযোগের উল্লেখ পাওয়া যায় জৈন গ্রন্থ আচারাঙ্গ সূত্রে । গ্রন্থটিতে তীর্থঙ্কর মহাবীর ও তাঁর সঙ্গীদের রাঢ় পরিভ্রমণের কাহিনী আছে । মহাবীর যখন রাঢ় অঞ্চলে এসেছিলেন তখন না কি রাঢ় ছিল পথবিহীন, অধিবাসীরা ছিল আচারহীন, তাদের ব্যবহারও নিষ্ঠুর । রাঢ়ের লোকেরা মহাবীর ও তাঁর সন্ন্যাসী সঙ্গীদের পেছনে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল । বিহারের স্থায়ীবসতিসম্পন্ন অঞ্চলের অধিবাসী জৈন সন্ন্যাসীদের কাছে রাঢ়বাসীর খাদ্য অপরিচ্ছন্ন, অরুচিকর বলে বোধ হয়েছিল । এ তো একেবারে প্রথম দিকের কথা । তারপরে দীর্ঘদিন ধরে স্থায়ীবসতিসম্পন্ন সমাজের সঙ্গে রাঢ়ের যোগাযোগ চলেছে । প্রায় , দেড় হাজার বছর পরে লেখা মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চন্ডীকাব্যে (ষোড়শ শতক) ও তারও পরে লেখা ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গলকাব্যে (অষ্টাদশ শতক) রাঢ় শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে অসভ্য , অসংস্কৃত, অমার্জিত অর্থে । ষোড়শ-অষ্টাদশ শতকে বাংলায় স্থায়ীবসতিসম্পন্ন লোকের কাছেও দেখছি রাঢ় কিছুটা অপাংতেয়, রাঢ়ের অধিবাসীরা অবজ্ঞার পাত্র । আধুনিককালেও তো রাঢ় , রাঢ়ী শব্দগুলো স্থায়ী-বসতিসম্পন্ন সমাজে অনুরূপ অর্থেই ব্যবহৃত হয় । দেখা যাচ্ছে দীর্ঘদিনের যোগাযোগ সত্ত্বেও স্থায়ী-বসতিসম্পন্ন সমাজের দৃষ্টিতে রাঢ়ের নিজস্ব পরিচয় অপরিবর্তিত । কিন্তু স্থায়ীবসতিসম্পন্ন সমাজের প্রভাবেই ষষ্ঠ শতকের পর থেকে রাঢ়ের জনজীবনে অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে । পরিবর্তনগুলোর ঐতিহাসিক তাৎপর্য লক্ষ্য করবার মত ।

৪

ধাতু সংগ্রহের সূত্রে রাঢ়ের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী স্থায়ীবসতিসম্পন্ন সমাজের যোগাযোগ কোন সময় থেকে আরম্ভ হয় সে কথা জানা যায় না । হিন্দুসমাজের বর্ণ-জাতি ভিত্তিক শ্রমবিভাগ ও উচ্চ-নীচ ভেদ এবং আর্য সংস্কৃতি খন্ডজাতীয় কৌম সমাজব্যবস্থা ও সংস্কৃতির ওপরে কি ভাবে প্রভাব বিস্তার করতে আরম্ভ করে এবং সে প্রভাব প্রথমদিকে কতটাই বা ব্যাপ্তি লাভ করেছিল তাও অজ্ঞাত । খন্ডজাতীয় কৌম জনগোষ্ঠী কি ভাবে ক্রমশ হিন্দুসমাজের অঙ্গীভূত হয়েছে সে সম্পর্কে ইদানীং কালে অনেক গবেষণা ও বিশ্লেষণ হয়েছে । এইসব আলোচনা-গবেষণায় হিন্দুসমাজ

ব্যবস্থা ও সংস্কৃতি প্রসারের ঐতিহ্যগত প্রক্রিয়া সম্পর্কে যে বিবরণ পাওয়া যায় ধরে নিতে পারি রাঢ়ের খন্ডজাতীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে হিন্দু সমাজ ও আর্য সংস্কৃতির প্রসার আরম্ভ হয়েছিল সেই ভাবেই । হিন্দু সমাজ ও সংস্কৃতি প্রসারের প্রক্রিয়া সম্পর্কে একটু পরেই আলোচনা করছি ।

৫

প্রথমদিকে হিন্দুসমাজ ও আর্য সংস্কৃতি রাঢ়ে কতটা ব্যাপ্তি লাভ করেছিল সেও অনুমান সাপেক্ষ । তবে এ বিষয়ে কিছু ঐতিহাসিক তথ্য-প্রমাণ আছে । আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার ১৮৭২-৭৩ সালের বাৎসরিক রিপোর্টে জে. ডি. বেগলার কর্তৃক সংগৃহীত বাংলার পুরাকীর্তি সমূহের বিবরণ প্রকাশিত হয় । বিবরণটিতে রাঢ়ের পুরাকীর্তি সমূহের বিস্তারিত পরিচয় দিয়ে বেগলার বলছেন পুরাকীর্তির কেন্দ্রগুলো প্রাচীন বাণিজ্যপথের ধারে ধারে গড়ে উঠেছিল । বেগলার পুরাকীর্তির কেন্দ্রগুলো ধরে বাণিজ্যপথগুলোর বিস্তার নির্দেশ করেছেন । একটা পথ মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল থেকে বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর, বোলাড়া, সোনাতপলে, এন্ডেশ্বর ও ছাতনা, পুরুলিয়া জেলার রঘুনাথপুর ও তেলকুপি এবং বর্ধমানের বরাকর হয়ে বিহারের ঝরিয়া দিয়ে রাজগৃহ (রাজগীর) এবং পাটলীপুত্র (পাটনা) যেত । এন্ডেশ্বরের কাছে এই পথটি যেখানে দ্বারকেশ্বর নদ অতিক্রম করত সেখান থেকে একটা শাখাপথ বেরিয়ে বর্ধমানের অজয় তীরবর্তী ভীমগড় ও বীরভূমের রাজনগর হয়ে যেত বিহারের মুদগিরিতে (মুঙ্গের) । আর একটি পথ পুরুলিয়ার বুধপুর, পাকবিরড়া হয়ে এবং বরাভূম ও দুলমির ভেতর বা পাশ দিয়ে পালামৌ হয়ে বারাণসী যেত । পাটলীপুত্রগামী পথটি যেখানে বরাকর নদী পার হ'ত সেখান থেকে একটা সংযোগকারী পথ ধনবাদ জেলার কাত্রাস এবং পুরুলিয়া জেলার পারা, ছড়রা হয়ে বারাণসীগামী পথের সঙ্গে পাকবিরড়া বা বুধপুরে গিয়ে মিলিত হ'ত । দুলমি থেকে আর একটি পথ যেত ঝরিয়াতে বারাণসীগামী ও পাটলীপুত্রগামী পথ দুটোর সংযোগকারী পথটির সঙ্গে দুলমি-ঝরিয়া পথের সংযোগস্থল ছিল পারাতে । বারাণসী ও পাটলীপুত্রের পথ দুটো যুক্ত ছিল বাংলার বন্দীপ অঞ্চলের বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্রগুলোর সঙ্গে । তাম্রলিপ্তের মত দক্ষিণ বাংলার বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগের প্রশ্নে

রাঢ়ের এই বাণিজ্যপথগুলোর গুরুত্ব অনস্বীকার্য । রাঢ়ের ঘনসংবদ্ধ পুরাকীর্তিগুলো এই সব বাণিজ্যপথের সমৃদ্ধির সঙ্গে যুক্ত বেগলারের এই অনুমান যুক্তিসঙ্গত বলেই মনে হয় ।

পুরাকীর্তিগুলি তৈরী হয়েছিল আনুমানিক ষষ্ঠ-সপ্তম শতক থেকে পঞ্চদশ শতকের মধ্যে । বেগলারের পরে এই সময়ের পুরাকীর্তি রাঢ়ে আরও আবিষ্কৃত হয়েছে । বীরভূম থেকে ময়ূরভঞ্জ পর্যন্ত প্রসারিত কঙ্করময় বনভূমির প্রায় সর্বত্রই পুরাকীর্তি অত্যন্ত ঘনসংবদ্ধ । বস্তুত: বাংলার অন্য কোন অঞ্চলে এত প্রাচীন পুরাকীর্তির একত্রসমাবেশ দুর্লভ । দূরপ্রসারী বাণিজ্যপথের ধারে ধারে এত নাগর মন্দির, জৈন ও ব্রাহ্মণ্য প্রতিমা এবং নগরীর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যে আর্থিক সমৃদ্ধি ও সমুন্নত সভ্যতার আভাস রয়েছে তা রাঢ়ের স্থানীয় জনজীবনের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য বলে মনে করবার কারণ নেই । পরোক্ষভাবে হলেও পুরাকীর্তিগুলো রাঢ়ের কৌম জনগোষ্ঠীসমূহের ওপর স্থায়ী বসতিসম্পন্ন সমাজের আর্থিক ব্যবস্থা ও সংস্কৃতিগত প্রভাবের সাক্ষ্য বহন করছে ।

৬

রাঢ়ে আর্যসংস্কৃতির একটা স্বতন্ত্র আঞ্চলিক রূপও দেখা দিয়েছিল । নাগর মন্দিরগুলো পর্যালোচনা করলে এর ইঙ্গিত পাওয়া যাবে । নাগর স্থাপত্যের বিবর্তন লক্ষ্য করলে দেখা যায় সমচতুষ্কোণ প্রকোষ্ঠের বাইরের দিকে মধ্যবর্তী অংশটা উদ্গত অর্থাৎ মূল স্তর থেকে উঠে এগিয়ে থাকে । ফলে চতুষ্কোনের প্রত্যেকটি বাহু তিনটি অংশে বা রথে বিভক্ত । এই নকশা অনুসারে গড়া দেওয়াল তিনটি প্রলম্ব অংশ বা পগে বিভক্ত হয়ে থাকে । পরবর্তীকালে দেখা যায় দেওয়াল আরও বেশী অংশে বিভক্ত, কারণ উদ্গত রথের সংখ্যা/ এক থেকে বেড়ে হয়েছে তিন বা / তিন থেকে পাঁচ । দেওয়ালের আদি স্তরের ওপরে ক্রমোচ্চভাবে ওঠা এবং উপর্যোপরি ভাবে বসান উদ্গত পগের সংখ্যা অনুসারে দেওয়াল ভাগ হয় পাঁচ বা সাতটা পগে । ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা যায় যে নাগর মন্দিরের গঠন ও বহিরূপের বিবর্তনের সঙ্গে পগবিভাগের সংখ্যাবৃদ্ধি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত । মন্দিরের প্রসার ও উচ্চতা বেড়েছে অধিকতর রথ সমন্বিত ও পগবিভক্ত দেওয়াল নিয়ে । কিন্তু রাঢ়ের সমুন্নত নাগর মন্দিরগুলোর দেওয়াল তিনটি মাত্র পগে বিভক্ত

অর্থাৎ উদ্গত অংশের সংখ্যা এক । কিন্তু গর্ভগৃহ ও মন্দিরের উচ্চতার অনুপাত ওড়িশা ও মধ্যভারতের পাঁচ বা সাত রথ-পগ বিশিষ্ট নাগর সম্মিলিত মন্দিরের তুলনায় কম নয় । রাঢ়ের তিনটি পগসমন্বিত নাগর মন্দিরগুলোর সুউচ্চ-শিখর/আচ্ছাদনের গড়ন দীঘল এবং হালকা । শিখর ওপরের দিকে উঠেছে স্বচ্ছন্দ এবং সাবলীল বহির্রেখা নিয়ে । মন্দিরদেহের পরিমাপ ত্রুটিহীন । বহিরূপ লালিত্যময় । মন্দিরগুলোর রূপকল্পনার মধ্যে যে মূলগত আলঙ্কারিক চরিত্রের ইঙ্গিত রয়েছে সেটা পরিস্ফুট হয়েছে শিখর আচ্ছাদনের ওপর সাজান ঘনসংবদ্ধ অনবদ্য অলঙ্করনের মধ্যে । রাঢ়ের এই বিশেষ ধরনের **নাগর** মন্দির স্থাপত্যের চরম বিকাশ দেখতে পাওয়া যাবে পুরুলিয়া জেলার দেউলঘাট, পারা ও তেলকূপি এবং বাঁকুড়া জেলার বোলাড়া গ্রামের প্রাচীন মন্দিরগুলোতে । নাগর মন্দিরের এই বিশিষ্ট রূপটাই নবম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত বাংলার গাঙ্গেয় বদ্বীপ প্রসার লাভ করেছিল । প্রকৃতপক্ষে নাগর মন্দিরের এই রূপটাই **বাংলায়** নাগর মন্দিরের আঞ্চলিক রূপ । আবার নাগর মন্দির স্থাপত্যের এই রূপের বিবর্তন থেকে উদ্ভূত হয় গাঙ্গেয় বদ্বীপের নবপর্যায়ের শিখর মন্দির ।

বাংলায় ভারতীয় মার্গ সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান প্রবেশপথ রাঢ় । নাগর মন্দিরের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায় মার্গ সংস্কৃতি রাঢ়ের মধ্য দিয়ে বাংলায় ঢোকবার পথে রাঢ়ের দেশী উপাদানের সংস্পর্শে এসে পরিবর্তিত হয়ে গেছে । নাগর মন্দিরের গঠন পরিকল্পনা ও রূপকল্পনা রাঢ়ের বাগ বা কোড় দেওয়া খড়ের চালের টানা রেখা, আদিবাসী চিত্রকলার স্বচ্ছন্দ দীর্ঘায়িত রেখা যা আদিবাসী নৃত্য ও গীতের জড়তাহীন গতিময়তা থেকে উৎসারিত এ কথা বলা বোধহয় অসঙ্গত হবে না । মনে হয়, বাংলায় মার্গ সংস্কৃতি যে রূপ পরিগ্রহ করেছিল তার মধ্যে রাঢ়ের দেশী উপাদান অনেকটাই ছিল । বাংলার ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের মধ্যে রাঢ়ী শ্রেণীর উদ্ভব এবং বদ্বীপ এঁদের বিস্তার এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ।

স্থায়ী বসতিসম্পন্ন হিন্দুসমাজের সংস্পর্শে আসবার ফলে রাঢ়ের রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও পরিবর্তন হয়েছে ।পরিবর্তনের ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায় না । তবে খণ্ডজাতীয় কৌম রাজনৈতিক ব্যবস্থার ওপরে কেন্দ্রীভূত শক্তি সমন্বিত রাজ্যের এবং তার ওপরে সংগঠিত রাষ্ট্র-ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে মনে হয় । সম্পদ ও ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণ হিন্দুসমাজ

ব্যবস্থা প্রসারের পরে আরম্ভ হওয়াই সম্ভব । কেন্দ্রীকরণের ফলস্বরূপ উদ্ভব হয়েছে রাজ্য এবং তার নিয়ন্তা রাজার । রাঢ়ে সংগঠিত রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ **কোন সময় আরম্ভ হয়েছে** সে কথা অজ
তবে
/বাংলার পাল রাজাদের আমলে (অষ্টম শতকের প্রথমার্ধ থেকে) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল **বলে** সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে । পরবর্তী পাল রাজাদের সময়ে (নবম শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে দ্বাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ) বাংলার অন্যান্য অংশের মত রাঢ়েও স্থানীয় সামন্তশক্তি বিশেষ পরাক্রান্ত । রামপাল (আনুমানিক ১০৭৭ - ১১২০) অনন্ত-সামন্তচক্রের পরাক্রমে অনধিকৃতবিলুপ্ত পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য যে সব সামন্তের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন রাঢ়ের অন্তর্ভুক্ত উচ্ছালার (বীরভূমের জৈন উঝিয়াল) রাজা ময়গল সিংহ, কুজবটীর (সাঁওতাল পরগণা, বিহার রাজা শূরপাল, ঢেক্করীয়র (বর্ধমান জেলার ঢেকুর-সেনপাহাড়ী) রাজা প্রতাপ সিংহ, তৈলকম্পের (পুরুলিয়া জেলার তেলকূপি) রুদ্রশিখর, কোটাটবীর (কোটেশ্বর, বাঁকুড়া জেলা) রাজা বীরগুণ, বাল-বলভীর (মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ পশ্চিম অংশে) রাজা বিক্রমরাজ ও অপর-মন্দারের (হুগলী জেলার পশ্চিম অংশের মন্দারণ) রাজা **লক্ষ্মীশূর** । রাজা লক্ষ্মীশূর ছিলেন আটবিক খন্ডের সামন্তচক্রচূড়ামণি । ধর্মমঙ্গলের আখ্যানে ঢেকুরের ইছাই ঘোষের কাহিনীও রাঢ়ের স্থানীয়, সামন্তশক্তির পরাক্রমের স্মৃতি বহন করছে ।

৮

ত্রয়োদশ শতকের প্রথমদিকে তুর্কী - আফগান মুসলমানরা বাংলায় প্রথম আসেন রাঢ়ের মধ্য দিয়ে । বখ্‌তিয়ার খিলজী বিহার থেকে বাংলায় ঢুকেছিলেন বীরভূমের অন্তর্ভুক্ত রাজনগরের পথে । কিন্তু ত্রয়োদশ শতকে মুসলমান অধিকার শুরু হওয়ার পর থেকে বাংলার দ্বারপথ হিসাবে রাঢ়ের গুরুত্ব ক্রমে হ্রাস পেতে থাকে । দক্ষিণ বা পশ্চিম থেকে বাংলার দিকে অথবা বাংলা থেকে ওই সব দিকে সৈন্য চলাচল কিছুটা ষোড়শ শতক অবধিও হয়েছে । কিন্তু সপ্তদশ শতক থেকে রাঢ়ের মধ্য দিয়ে সামরিক অভিযান বাংলায় আর আসছে না । তার আগেই রাঢ়ের পথে বাণিজ্যসম্ভার চলাচল কমে গেছে । সাংস্কৃতিক যোগাযোগের প্রশ্নে উত্তরবঙ্গ দিয়ে যাতায়াতটাই হচ্ছে বেশী । এইসব কারণে রাঢ় ক্রমে দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে । ষোড়শ

শতকের গোড়ার দিকে শ্রীচৈতন্য পুরী থেকে বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন ঝাড়খন্ডের পথে। 'চৈতন্যচরিতামৃত' কার কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলছেন প্রভু প্রসিদ্ধ পথ ছেড়ে ঝাড়খন্ডের উপপথ দিয়ে যাত্রা করলেন; সে পথ তখন হিংস্র জন্তু সমাকীর্ণ, বিপদসংকুল।

১

বাংলার ইতিহাসে রাঢ়ের ভূমিকা সংকুচিত হয়েছে বটে, কিন্তু বিহার, ওড়িশা বা বাংলার স্থায়ী বসতিসম্পন্ন হিন্দু সমাজের সঙ্গে রাঢ়ের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয় নি। রাঢ়ের পথ বেয়ে বাণিজ্যসম্ভার নিয়ে দূরগামী সার্থবাহ চলাচল বন্ধ হয়ে গেলেও লোহা ও তামার উৎপাদন ও ব্যবসা চলেছে নিরবচ্ছিন্নভাবে। এই কারণে বাংলার স্থায়ী বসতিসম্পন্ন সমাজের রাঢ় সম্পর্কে আগ্রহও অক্ষুণ্ণ। ছোটনাগপুরের অরণ্যভূমিতে খন্ডজাতির নিজস্ব পদ্ধতিতে লোহার ও আগারিয়ারা লোহা তৈরী করেছে উনবিংশ শতকের পরেও। কিন্তু বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও মানভূমের লোহা ও তামার বড় কেন্দ্রগুলোতে উৎপাদন ও বাণিজ্য দেখছি কর্মকার, তেলী, কলু, গন্ধবণিক, সুবর্ণবণিক প্রভৃতি হিন্দু জাতের হাতে। ক্ষেত্র বিশেষে হয়ত দেখা যাবে লোহার বা আগারিয়ারাই কর্মকার জাতিতে রূপান্তরিত এবং সেই সূত্রে হিন্দু সমাজেরও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তেলী এবং কলুদের মধ্যেও হিন্দু জাতিতে রূপান্তরিত আদিবাসী কারিকর থাকা বিচিত্র নয়। কিন্তু গন্ধবণিক ও সুবর্ণবণিকদের ক্ষেত্রে আদিবাসী সংমিশ্রনের সম্ভাবনা কম। এঁরা পূর্বদিক থেকে এসেছিলেন বলেই মনে হয়। কর্মকার, তেলী ও কলুদের অংশবিশেষও বোধকরি পূর্বদিকের স্থায়ী বসতিসম্পন্ন অঞ্চল থেকে আগত। স্থানীয় কারিকররা যদি এই জাতগুলোর মধ্যে এসে থাকে তবে সেটা বাংলার আঞ্চলিক জাতিব্যবস্থা অনুসারে এবং তারই প্রভাব হয়েছে।

১০

ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে সুলতানী ও মুঘল আমলে রাঢ়ের ওপর সংগঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থার কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কখনই প্রবল হয়ে ওঠে নি। রাঢ়ের জঙ্গলাকীর্ণ অসমান ভূমির মধ্য দিয়ে চলাচলের পথ সে সময় বেশী ছিল না। ফলে এই দুরাধিগম্য অঞ্চলে প্রত্যক্ষ

নিম্ন-স্তর প্রসারের চেষ্টাও মুসলমান শাসকবর্গ বেশী করেন নি। রাঢ়ের স্থানীয় রাজারা রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা মেনে নিলেই তাঁরা সন্তুষ্ট থাকতেন। এমন কি অধীনতার নিদর্শনস্বরূপ নিয়মিত রাজস্ব সংগ্রহেও তাঁরা অধিকাংশ সময়েই তৎপর হন নি। কিন্তু রাঢ়ের মধ্যে স্থানীয় পর্যায়ে সংগঠিত রাজ্যস্থাপনের প্রক্রিয়া এই সময়ে অব্যাহত। পঞ্চদশ শতক থেকে রাঢ়ে অনেকগুলো নতুন রাজবংশের উদ্ভব হয়েছে বলে জানা যায়। পাল রাজাদের সময় রাঢ়ের যে সব সামন্তরাজার নাম পাওয়া যায় তাঁদের দুই-একজন ছাড়া সবারই জাতি বা সাংস্কৃতিক পরিচয় অজ্ঞাত। পঞ্চদশ শতক থেকে যাঁরা রাঢ়ে রাজ্য স্থাপন করেছেন তাঁদের মধ্যে কিছু বহিরাগত আছেন বটে, কিন্তু বেশীর ভাগই স্থানীয় লোক। বহিরাগতরা এসেছেন পূর্বদিকের গঙ্গা তীরবর্তী এলাকা, দক্ষিণে ওড়িশা ও পশ্চিমে বিহার ও উত্তরপ্রদেশ থেকে। পূব দিক থেকে এসে দিগনগর ও রাজ্যস্থাপন করেছেন গোপ ভাগ্যান্বেষীরা। গোপভূমের (বর্ধমান জেলা) অম্বরাগড়, ভরতপুর,/ কাঁকসা এবং মেদিনীপুর জেলার কর্ণগড়, নারায়ণগড় ও ধারেন্দা প্রভৃতি রাজবংশ গোপদের স্থাপিত। পশ্চিম থেকে যাঁরা এসেছেন তাঁরা পরিচয় দেন রাজপুত বলে। স্থানীয় আদিবাসী কৌম গোষ্ঠী থেকে যে রাজবংশগুলো উদ্ভূত হয়েছিল তার মধ্যে বিষ্ণুপুর, রাইপুর, ফুলকুসমা, ছাতনা, বগড়ী, রামগড়, ঝাড়গ্রাম, শিলদা, ধলভূম, ময়ূরভঞ্জ, শিখরভূম বা পাঁচেত, বরাভূম, মানভূম, ধলভূম ও ময়ূরভঞ্জের রাজবংশ উল্লেখযোগ্য।

বহিরাগত এবং স্থানীয় কৌমগোষ্ঠীজাত উভয় ধরনের রাজবংশই রাজ্য স্থাপন প্রক্রিয়া আরম্ভ করেছিলেন ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ভূ-সম্পত্তির জোরে। কৌম সমাজ হিন্দু-সমাজের প্রভাবাধীন হবার ফলে স্বয়ংক্রিয় স্বয়ংসিদ্ধ কৌম ব্যবস্থা অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। বৃহত্তর সামাজিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমবিভাগ, বাজারে উৎপন্নবস্তুর লেন-দেন ও উচ্চ-নীচ ভেদের মধ্যে সম্পদ ও ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের সুযোগ নিহিত ছিল। এর ফলেই কৌম ব্যবস্থা ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রভাবশালী লোকেরা ব্যক্তিগত মালিকানায় ভূ-সম্পত্তি বাড়িয়ে ও স্থানীয় রাজনৈতিক শক্তি কেন্দ্রীভূত করে রাজ্যস্থাপন করলে কৌম ব্যবস্থা আরও খানিকটা ক্ষুণ্ণ হয়। কিন্তু রাজারা ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ভূমির বাইরে গ্রাম পর্যায়ে ভূমি ব্যবস্থা বা সমাজশাসনে সাধারণতঃ হস্তক্ষেপ করতেন না। এগুলো করতেন খুঁটকাটিদার, মুণ্ডা,

মানকি, মাঝি, মাহাতো, মন্ডল উপাধিধারী গ্রামপ্রধানগণ। রাজারা কর সংগ্রহ করতেন এদের মাধ্যমে। গ্রাম নিয়ন্ত্রণ ও গ্রামের আভ্যন্তরিক ব্যবস্থা পরিচালনা করতেন এঁরাই। রাজার জন্য উদ্বৃত্ত সংগ্রহ করাও গ্রামপ্রধানের কাজ। এঁদের ক্ষমতা ও অধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে রাজারা গড়ে তুলতেন রাজ্যের আভ্যন্তরিক রাজনৈতিক কাঠামো।

১১

আদিবাসী কৌম গোষ্ঠীসমূহের হিন্দুসমাজের মধ্যে সূত্র-জাতিতে রূপান্তর প্রক্রিয়া সম্পর্কে শরৎচন্দ্র রায় ও নির্মলকুমার বসু বিস্তারিত আলোচনা ও বিশ্লেষণ করেছেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ই. এ. ডালটন ও এইচ. এইচ. রিজলীর বিবরণও প্রণিধানযোগ্য। এঁদের লেখা পড়লে বোঝা যায় যে হিন্দুসমাজের জাতিভিত্তিক শ্রমবিভাগ, উৎপাদন ও বন্টনব্যবস্থা কৌম গোষ্ঠীগুলোর ওপর প্রভাব বিস্তার করছিল। মন্ডজাতির কৌম আর্থিক ও সামাজিক ব্যবস্থার তুলনায় হিন্দুসমাজ ব্যবস্থার মধ্যে অধিকতর সমৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি যে ছিল তাতে সন্দেহ নেই। উন্নততর সমাজব্যবস্থার সংস্পর্শে আসবার পর / আদিবাসী কৌম গোষ্ঠীগুলো যে সে দিকে আকৃষ্ট হবে এটাই স্বাভাবিক। উপরন্তু সেই ব্যবস্থা যদি ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের ফলে সমৃদ্ধ হয় তবে আর্থিক ও সামাজিক যুক্তিতে আদিবাসীরা অনিবার্যভাবেই তার অঙ্গীভূত হবে।

১২

আদিবাসী কৌম গোষ্ঠী হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল হিন্দু আর্থিক ও সামাজিক ব্যবস্থা নিয়ে। এই সূত্র মেনে নিলে ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রশ্নে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দিয়ে হিন্দু ঐতিহ্যের মধ্যে অঙ্গীভূত হবার প্রত্যক্ষ তাগিদ হিন্দুসমাজের দিক থেকে বিশেষ থাকে না। হিন্দুসমাজের প্রান্তবর্তী জনগোষ্ঠীর ধর্মাচরণ, উৎসব-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি, আচার-ব্যবহারে হিন্দুসমাজ তেমন একটা হস্তক্ষেপ করে নি। তবে উন্নততর সমাজব্যবস্থার সংস্কৃতি স্বভাবতঃই আদিবাসী সমাজের ওপর প্রভাব বিস্তার করে' তার সাংস্কৃতিক জীবন ক্রমশ পরিবর্তিত করেছে। হিন্দুসমাজের বিশ্বাস, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, পদ্ধতি প্রান্তবর্তী জনগোষ্ঠীর মধ্যে ক্রমশ সংক্রমিত হয়েছে। এইভাবে মিলন-মিশ্রনের ফলে প্রান্তবর্তী জনগোষ্ঠীর

সাংস্কৃতিক জীবন হয়ে উঠেছে বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং সমৃদ্ধতর। অন্যদিকে ব্রাহ্মণশাসিত হিন্দুসমাজও প্রান্তবর্তী জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি থেকে উপাদান সংগ্রহ করে নিজেদের ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য করে সমন্বয় সাধন করে নিয়েছে। বাসুলী, বিশালক্ষ্মী, চন্ডী, রংকিনী, ভৈরব, ধর্মঠাকুর, ক্ষেত্রপাল প্রভৃতি কৌম ও লৌকিক দেবতার ক্রমান্বয়ে ব্রাহ্মণ্যকরণ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। স্মার্ত-পৌরাণিক ধ্যান-ধারণার প্রভাবে ক্রমশ রূপান্তরিত হয়ে এই সব দেব-দেবী অবশেষে পৌরাণিক দেবতার সঙ্গে প্রায় সমমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন। আপাতদৃষ্টিতে এর বিপরীত দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যাবে ইঁদপুজার অনুষ্ঠানে। হিন্দু ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগাযোগের সূত্রে বৈদিক দেবতা বৃষ্টি ও বজ্রের অধিপতি ইন্দ্র প্রান্তবর্তী জনগোষ্ঠীর আদি বৃষ্টিদেবতার সঙ্গে একত্রিত হয়ে ইঁদ বলে পরিচিত হয়েছেন। ইন্দ্রধ্বজের অনুকরণে শাল গাছের কান্ড মাটিতে বসিয়ে ইঁদপূজা করা হয়। ইঁদপূজা তো একটা দৃষ্টান্ত। প্রান্তবর্তী জনগোষ্ঠীর, ধর্মাচরণ, উৎসব অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি একটু মনোযোগ দিয়ে দেখলেই হিন্দু সাংস্কৃতিক প্রভাবের প্রচুর দৃষ্টান্ত চোখে পড়বে।

প্রান্তবর্তী জনগোষ্ঠীর নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যগত হিন্দু সংস্কৃতির মধ্যে দেওয়া-নেওয়ার প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করলে দুইধরণের প্রবণতা ধরা পড়ে। হিন্দুসমাজের প্রান্তবর্তী জনগোষ্ঠী হিন্দু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অনুসারে নিজেদের একটা নতুন পরিচয় স্থাপন করে হিন্দু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে একত্রিত হ'তে চাইছে। অপরদিকে হিন্দুসমাজ চাইছে প্রান্তবর্তী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সামঞ্জস্য ও সমন্বয় সাধন করতে। হিন্দু সমাজ এই প্রচেষ্টা করছে প্রান্তবর্তী জনগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করে নিয়ে। প্রয়োজনমত হিন্দুসমাজ বেশ কিছুটা নমনীয়ও হয়েছে। কতটা নমনীয় হ'তে পারে তার প্রমাণ পাওয়া যায় রাঢ়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের বৃত্তান্তে। 'ভক্তিরত্নাকর', 'শ্যামানন্দপ্রকাশ', 'প্রেমবিলাস', 'রসিকমঙ্গল' প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব কাব্য গুলোতে বাঁকুড়া জেলা ও মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম ও পার্শ্ববর্তী বিহারের সিংভূম জেলায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। প্রান্তবর্তী জনগোষ্ঠীর মধ্যে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব প্রচারকরা বৈপরীত্য সত্ত্বেও লৌকিক ও কৌম উপাদান যতটা সম্ভব গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের ব্যবহারিক রূপের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করে নিয়েছিলেন। নেওয়া সম্ভব না হলে প্রচারকরা তার সামাজিক তাৎপর্য মেনে নিয়েছেন।

আগের সব কিছু ছেড়ে তবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব হ'তে হবে এমন সর্ত তাঁরা আরোপ করেন নি। বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর জেলায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের ব্যবহারিক রূপটা লক্ষ্য করলে এই কথার সমর্থন মিলবে। ভক্তরা কিছু কিছু বৈষ্ণব আচার মেনে চলেন, সাধু, মোহন্তর সেবা করেন, মহোৎসব করেন, হরিমেলায় একত্রিত হয়ে হরিনাম সংকীর্তন করেন। আবার পশু বা পক্ষী বলি দিয়ে লৌকিক ও কৌম দেবদেবীর পূজাও করেন। বৈষ্ণব প্রচারকরা এটা মেনে নিয়েছেন। ভক্তদের যদি মুরগীর মাংস খাওয়াতেও বৈষ্ণব মোহন্তরা আপত্তি করেন না। হরিবোল আর মুরগীমাংসের ঝোল সমান উপাদেয় এমন একটা প্রবাদ পর্যন্ত লোকের মুখে ফেরে।

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উন্নততর হিন্দুসমাজের সঙ্গে আদিবাসী কৌম জনগোষ্ঠী যোগাযোগের প্রারম্ভ এই সব সর্তে। তবে উন্নততর সমাজের সাংস্কৃতিক প্রভাব ক্রমশ ব্যাপকতরভাবে কার্যকর হয়েছে। প্রান্তবর্তী জনগোষ্ঠীর মধ্যে হিন্দুসমাজের ব্যবহারিক ধর্ম স্মার্ত-পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাবে ব্রাহ্মণ্যকরণের প্রবণতা তারই লক্ষণ।

১৩

চতুর্দশ পঞ্চদশ শতক থেকে রাঢ়ে যে-সব রাজবংশের উদ্ভব হয়েছিল তারাই দেখছি রাঢ়ের ব্রাহ্মণ্যকরনের প্রশ্নে অগ্রণীর ভূমিকায় অবতীর্ণ। আনুমানিক ষষ্ঠ শতক থেকে আর্য সংস্কৃতি রাঢ়ে বিস্তার লাভ করছিল। ভারতীয় মার্গ সংস্কৃতির চর্চাও রাঢ়ে যথেষ্ট হয়েছে। রাঢ়ের প্রাচীন নাগর মন্দির, মূর্তি ও নগরীর ধ্বংসাবশেষগুলোই তার প্রমাণ। কিন্তু ত্রয়োদশ শতক থেকে অবস্থার পরিবর্তন হওয়াতে মার্গ সংস্কৃতির প্রভাব ক্ষীয়মান হয়ে উঠতে শুরু করে। চতুর্দশ পঞ্চদশ শতকীয় নাগর মন্দিরগুলো দেখলেই রাঢ়ে মার্গ সংস্কৃতির অবক্ষয়ের ধারাটা বোঝা যায়। কারিগরির অবনতি হয়েছে; রূপকল্পনায় সৌকর্য, সৌন্দর্যবোধ আর নেই। মন্দিরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিন্যাসের তাৎপর্যও লুপ্ত হবার মুখে। পঞ্চদশ শতক থেকে ঐতিহ্যাগত রূপের নাগর মন্দির আর তৈরীও হয় নি। মার্গ সংস্কৃতির আগেকার সৃজনশীল ঐতিহ্যের প্রভাব রাঢ়ে আর বিশেষ নেই, প্রায় নিষ্ক্রিয় হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যে ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনে দেখা দিয়েছে দুটো ধারা।

একটা আর্য সংস্কৃতি থেকে সঞ্জাত স্মার্ত-পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যবাদের সংস্কৃতি। অপরটি ভারতের বিভিন্ন অংশের আঞ্চলিক সংস্কৃতি। স্মার্ত-পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যবাদ সমাজের উচ্চকোটীতে কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ বিকাশ লাভ করেছে সামাজিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যম হিসাবে আঞ্চলিক সংস্কৃতি। ভারতের অন্যান্য অংশের মত বাংলাতেও সৃ… হয়েছে আঞ্চলিক বাঙ্গালী সংস্কৃতি। পঞ্চদশ ষোড়শ শতক আঞ্চলিক বাঙ্গালী সংস্কৃতির চরম বিকাশের সময়কাল। আঞ্চলিক বাঙ্গালী সংস্কৃতি রাঢ়ে বিস্তার লাভ করেছিল স্থানীয় [illegible] রাজবংশগুলোর আনুকূল্যে। এঁদের অনেকেই বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। মন্দির স্থাপনের সময় ঐতিহ্যগত নাগর মন্দিরের পরিবর্তে আঞ্চলিক বাঙ্গালী স্থাপত্যের চালা ও রত্ন মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু তুলনা কর… দেখা যাবে এঁদের আগ্রহ অনেক বেশী স্মার্ত-পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে। সাংস্কৃতিক রূপান্তরের প্রশ্নে… তাঁরা হিন্দু সংস্কৃতির এই ধারাটাকেই অবলম্বন করলেন।

১৪

স্মার্ত-পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যবাদের সর্তে সাংস্কৃতিক রূপান্তর উদ্দেশ্যে স্থানীয় রাজারা ব্রাহ্মণ্যবাদের বিশ্বাস, রীতি-নীতি, আচার-আচরণ সাগ্রহে বরণ করে নিলেন। বহিরাগত রাজবংশগুলোর প্রতিষ্ঠাতারা অনেকেই অজ্ঞাতকুলশীল। স্থানীয় জনগোষ্ঠী থেকে যাঁরা উদ্ভূত হয়েছে… রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরও তাঁদের কৌম সম্পর্কগুলো সুপরিজ্ঞাত থেকেছে। কৌম সাংস্কৃতিক পরিবেশের… মধ্যে থেকে সম্পর্কগুলো ছিন্ন করা সম্ভব হয় নি। উপরন্তু তাঁদের আচার-আচরণও সাধারণ লো… তুলনায় বিশেষ আলাদা নয়। ফলে স্থানীয় কৌম জনগোষ্ঠী সঞ্জাত ও বহিরাগত উভয় ধরণের… রাজবংশের পক্ষেই স্বাতন্ত্র্য অর্জন ও সামাজিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করে ক্ষমতার সামাজিক স্বীকৃতি অর্জন… অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। প্রচেষ্টা-টা তাঁরা করলেন স্মার্ত-পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি অবলম্বন ক…

উচ্চতর বংশগত পরিচয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা এই প্রচেষ্টারই অঙ্গ। অধিকাংশ বহিরাগত… রাজবংশ এবং প্রায় সব স্থানীয় কৌম জনগোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত রাজবংশই দেখা যাচ্ছে রাজপুত ক্ষত্রিয় বলে পরিচিত হ'তে উৎসুক। বিভিন্ন রাজবংশের উদ্ভব নিয়ে নানা কাহিনী প্রচলিত আ…

এর মধ্যে একটা কাহিনী বহুল প্রচলিত । গল্পটা বিভিন্ন রূপে শোনা যায় বটে, তবে মূল বিষয়বস্তু সবক্ষেত্রে একই । রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা স্থানীয় লোক নন । তিনি পশ্চিম থেকে আগত রাজপুত এবং তাঁর জন্ম সূর্য বা চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় পরিবারে । প্রতিষ্ঠাতার পিতা হয়ত কনৌজ বা রাজপুতানায় রাজা ছিলেন । তিনি জগন্নাথদর্শনের উদ্দেশ্যে সন্তানসম্ভবা স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে রাঢ়ের মধ্য দিয়ে পুরী যাচ্ছিলেন । যাবার পথে তাঁদের একটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয় । জগন্নাথদর্শনের বিঘ্ন হয় দেখে তীর্থযাত্রী ক্ষত্রিয় সদ্যোজাত পুত্রটিকে (অথবা পুত্র এবং মাতা দু'জনকেই ত্যাগ করে পুরীর দিকে চলে যান । ভাগ্যক্রমে শিশুটি এক ব্রাহ্মণের তত্ত্বাবধানে বড় হয়ে ওঠে । অবশেষে তারপরে ঘটনাচক্রে সেই ব্রাহ্মণের সহায়তায় রাজপদে অভিষিক্ত হয় ।

এই ধরনের কাহিনী বানিয়ে সেটাকে চালু করে দেবার জন্যে গুরু, পুরোহিত ব্রাহ্মণপন্ডিত, মঠধারী সাধু, আখড়াধারী মোহন্ত এঁদের সহায়তা প্রয়োজন । শাস্ত্রজ্ঞানে এঁদেরই অধিকার, ধর্মের তত্ত্বও তাঁদের আয়ত্ব । সুতরাং সাধারণ লোকে তাঁদের কথা বিশ্বাস করবে । আবার সামাজিক ও ধর্মীয় রীতি-নীতি, আচার-আচরণ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্মার্ত-পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যবাদের অনুবর্তী করে তুলতে হ'লে এঁদের সাহায্য অত্যাবশ্যক । উপযুক্ত পরামর্শ উপদেশ দেওয়া, ভুল-ত্রুটি সংশোধন করে দেওয়ার অধিকার একমাত্র এঁদেরই আছে । রীতি-নীতি, আচার-আচরণের সংস্কার ও রূপান্তর সংগঠিত করে তুলতে হ'লে এবং জনসমক্ষে এ সব প্রচার করতে হ'লে নিয়মিত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা চাই । এর জন্য মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে হয় । মঠ আখড়ার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হয় । সাধু মোহন্তদের পৃষ্ঠপোষকতা করতে হয় ।

বাংলার অন্যান্য অংশের ভূস্বামীদের তুলনায় রাঢ়ের রাজাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ্যকরণের ঝোঁকটা একটু বেশী । চতুর্দশ থেকে সপ্তদশ শতকের মধ্যে বাংলার ব-দ্বীপ অঞ্চলে অনেক নতুন রাজা, জমিদারের উদ্ভব হয়েছে । এঁদের মধ্যেও বহিরাগত আছেন । যাঁরা বাঙ্গালী তাঁদেরও যে সব ক্ষেত্রে স্থানীয় পরিচিতি ও মর্যাদা ছিল তা নয় । নতুন ভূস্বামীদের অনেকেই বলতে গেলে অজ্ঞাতকুলশীল । সমাজের শীর্ষে অবস্থান করার জন্য চেষ্টা এঁরা করেছেন । এই উদ্দেশ্যে গৌরবাত্মক বংশ পরিচয় অর্জন করা ও উচ্চতর সামাজিক মর্যাদা অর্জন করবার

প্রচেষ্টা তাঁদের ছিল । কিন্তু রাঢ়ের ভূস্বামীর মত বঙ্গীপের ভূস্বামীরা কেউই কিন্তু রাজপুত ক্ষত্রিয় হ'তে চান নি । তাই বঙ্গীপের ভূস্বামীদের মধ্যে অবশ্যাবৈগুণ্যে পিতৃপরিত্যক্ত ক্ষত্রিয় শিশুর ব্রাহ্মণের সহায়তায় রাজলাভের মত কাহিনীও প্রচলিত নেই । তাঁরা চেয়েছেন বাংলায় প্রচলিত জাতি ব্যবস্থার মধ্যে উচ্চতর জাতি পরিচয় । ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থদের নিয়ে বাংলার উচ্চজাতি । যাঁরা উচ্চজাতি নন তাঁরা হয়ত চেয়েছেন বৈদ্য বা কায়স্থ বলে পরিচিত হ'তে । যাঁরা নবশাখ পর্যায়ভুক্ত নন তাঁদের প্রচেষ্টা নবশাখ হওয়া । রামায়ণ মহাভারত বা অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থের মাধ্যমে ক্ষত্রিয়ের মহিমা ব-দ্বীপে যে বহুল প্রচারিত ছিল তাতে সন্দেহ করবার কিছু নেই । কিন্তু বাংলার নিজস্ব জনের মধ্যে ক্ষত্রিয় বর্ণ কখনও সৃষ্ট হয় নি । অপরপক্ষে ভূস্বামী ও যোদ্ধা হিসাবে রাজপুতদের যে খ্যাতি ও গৌরব উত্তর ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত বাংলার গাঙ্গেয় বঙ্গীপের জনমানসে তার কোন প্রভাব ছিল না বলেই মনে হয় । বঙ্গীপের ভূস্বামীরা তাই ক্ষত্রিয়ত্ব বা রাজপুত পরিচয়ের জন্য প্রলুব্ধ হন নি । রাঢ়ের গোপ রাজগুলোর আশে পাশে প্রায় সবাই তো রাজপুত-ক্ষত্রিয় হবার জন্য ব্যগ্র । তার মধ্যে থেকেও কিন্তু পূর্বদিক থেকে আগত গোপ রাজবংশগুলো রাজপুত - ক্ষত্রিয় হবার চেষ্টা করেন নি । তাঁদের উচ্চতর সামাজিক পরিচয়ের আকাঙ্খা গোপ থেকে সদ্গোপ হওয়া এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ । স্পষ্টতই রাঢ়ের অধিকাংশ রাজবংশের কাছে বাংলার আঞ্চলিক জাতি ব্যবস্থার তুলনায় বর্ণ পরিচয়ের তাৎপর্য বেশী, আবার উত্তর ভারতের রাজপুত ঐতিহ্যও তাঁদের কাছে কম অর্থবহ নয় । বংশ পরিচয় স্থাপনের প্রশ্নে তাঁরা ভারতীয় মার্গ ঐতিহ্যের অনুবর্তী ।

৫

গুরু, পুরোহিত ব্রাহ্মণপন্ডিত, সাধু, মোহন্তর, অথবা মঠ মন্দির আখড়ার পৃষ্ঠপোষণ করবার শ্রেষ্ঠ উপায় দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তর, ব্রহ্মোত্তর প্রভৃতি নিষ্কর ভূমিদান । রাঢ়ের রাজারা এবং তাঁদের অধীনস্থ সর্দার, পারিষদবর্গ প্রভৃতি উদারহস্তে নিষ্কর ভূমি দান করেছেন । বিষ্ণুপুরের মল্লরাজারা এত ব্রহ্মোত্তর দিয়েছিলেন যে মল্লরাজ্যে যে ব্রাহ্মণের নিষ্কর ভূমি ছিল না তাঁর ব্রাহ্মণত্বেই লোকে সন্দেহ পোষণ করত । রাজা তাঁর নিজস্ব খাস জমি দান

করতে পারতেন । তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিষ্কর জমি দেওয়া হয়েছে খাস এলাকার বাইরে, স্বয়ং শাসিত গ্রামে । তাই ব্রহ্মোত্তর, দেবোত্তর বা বৈষ্ণবোত্তর বলে দান করা জমিতে স্বত্বের পরিবর্তন খানিকটা হ'ত । কারণ দানগ্রহীতা আসতেন ভূমির উপস্বত্বে অধিকার পেয়ে । অপরপক্ষে, রাজার সঙ্গে গ্রাম-প্রধানের এবং গ্রাম প্রধানের সঙ্গে গ্রামবাসীর সম্পর্কেরও পরিবর্তন কিছুটা হ'ত । দানগ্রহীতার স্থান রাজা ও গ্রামপ্রধানের মধ্যে হ'তে পারে । আবার গ্রামপ্রধানকে এড়িয়ে দানগ্রহীতা সরাসরি কৃষকের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে নিতে পারতেন । ফলে রাজা ও গ্রামপ্রধান এবং গোষ্ঠী ও গ্রামপ্রধানের মধ্যে যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল সেটা ক্ষুণ্ণ হ'তে আরম্ভ করল । প্রজার প্রতি রাজার এবং গ্রামবাসীর প্রতি গ্রামপ্রধানের কিছু কর্তব্য এবং দায়-দায়িত্ব ছিল । সে রকম কোন কর্তব্য বা দায়-দায়িত্ব পালন করবার বাধ্য-বাধকতা নতুন উপস্বত্বের অধিকারী দানগ্রহীতার নেই, অথচ উদ্বৃত্ত সংগ্রহের অধিকার তার পুরোপুরি । রাজ্য স্থাপনের ফলে খণ্ডজাতীয় কৌম ব্যবস্থার ওপর আঘাত পড়েছিল ! তখন যে সামঞ্জস্য হয়েছিল নিষ্কর ভূমি গ্রহীতারা এসে পড়বার ফলে সেটাও খানিকটা বিপর্যস্ত হতে আরম্ভ করল ।

৮৬

রাজার প্রশাসনে বিস্তার, জাঁকজমক ও ভোগসুখের উপকরণ বৃদ্ধি হলে অর্থাৎ রাজার ব্যয়বাহুল্যের ফলেও রাজ্যের আর্থিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন হ'তে পারত । সুলতানী আমলে রাঢ়ের রাজারা রাঢ়ের বাইরে বিশেষ যেতেন না । সুলতানী প্রশাসনের সঙ্গে বা বাইরের ভূস্বামীদের সঙ্গে তাঁদের সম্যক পরিচয় ছিল বলেও মনে হয় না । ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ ও সপ্তদশ শতকের প্রথমদিকে বাংলা জয় করবার সময় মুঘলরা রাঢ়ের রাজাদের বশীভূত করবার জন্য কয়েকবার অভিযান প্রেরণ করেছিলেন । রাঢ়ের রাজারা মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করে নেন । কয়েকজন রাজা মুঘলদের সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়ে অভিযানে অংশগ্রহণও করেছিলেন । এইসূত্রে রাঢ়ের রাজারা মুঘলদের সংস্পর্শে আসেন । পরে কয়েকজন রাজা ঢাকা, মুর্শিদাবাদ এমন কি আগ্রাতেও গিয়েছিলেন । রাঢ়ের রাজারা এতদিন আভ্যন্তরিক সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্থানীয় সমাজে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করছিলেন । এখন সম্রাট, সুবাদার, রাজসভা, রাজধানী এবং অভিজাতবর্গের জীবনযাপন প্রণালী দেখে রাঢ়ের রাজারা প্রভাবিত হয়ে উঠলেন

আড়ম্বরপ্রিয় । সামাজিক সম্পতির মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে রাজনীয় ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যের নিদর্শন দেখিয়ে লোকের মনে সম্ভ্রম উৎপাদন করবার বাসনাও তাঁদের হ'তে থাকে ।

ছোটনাগপুরের নাগবংশী রাজা দুর্জনসাল সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে মুঘল সৈন্যবাহিনীর কাছে পরাজিত ও বন্দী হন । বন্দী অবস্থায় গোয়ালিয়র দুর্গে কিছুদিন থাকবার পর সম্রাটের অনুগ্রহে মুক্তিলাভ করেন । স্বরাজ্যে ফেরবার পথে দুর্জনসাল আগ্রায় গিয়েছিলেন । দুর্জনসাল বন্দী হবার আগে ছোটনাগপুরের রাজারা সাধারণভাবে জীবনযাপন ও শাসনকার্য পরিচালনা করতেন । তাঁদের রাজধানী ছিল খুক্রা গ্রামে । প্রবাদ আছে সেখানে বাহান্নটি বাগান ও তিপান্নটি পুকুর ছিল । কিন্তু বড়-বাড়ী-ঘর, দুর্গ, তোরণ এসব কিছুই সেখানে ছিল না । ফিরে এসে দুর্জনসাল খুক্রা পরিত্যাগ করে দোইসানগরে গড়খাইযুক্ত বিরাট নওরতন রাজপ্রসাদ নির্মাণ করলেন এবং মন্দির প্রভৃতি সৌধ তৈরী করে রাজধানী সজ্জিত করে তুললেন । দুর্জনসাল এবং তাঁর উত্তরাধিকারী রাজ্যের বিভিন্নস্থানে আরও মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । বিষ্ণুপুরের মল্লরাজারা প্রথমে নাউগ্রামে বাস করতেন । সেখানে তাঁরা উল্লেখযোগ্য কোন প্রাসাদ বা মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে জানা যায় না । নাউগ্রামে কোন ধ্বংসাবশেষও নেই । আনুমানিক ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে মল্লরাজারা বিষ্ণুপুরে এসে নতুন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন । এই সময় বাংলায় মুঘল অভিযান আরম্ভ হয় । ষোড়শ শতকের শেষদিকে মুঘল সেনাবাহিনী রাঢ়ে প্রবেশ করে । সেই সময় বিষ্ণুপুরের রাজা হাম্বীর মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করে মুঘল বাহিনীতে যোগ দেন । কিছুদিন পরে, সপ্তদশ শতকের প্রথমদিকে, হাম্বীর শ্রীনিবাস আচার্যের প্রভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন । বিষ্ণুপুরে মন্দির প্রতিষ্ঠা হাম্বীরের আমলে তাঁর উদ্যোগেই আরম্ভ হয় । ক্রমে বিষ্ণুপুরের রাজারা গড়খাই, প্রাচীর ও তোরণযুক্ত দুর্গনির্মাণ করেন । রাজধানীর মধ্যে দুর্গ এলাকার ভিতরে ও বাইরে বিষ্ণুপুরের রাজারা বহু মন্দিরও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । রাজধানীর বাইরেও মল্লরাজাদের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের সংখ্যা প্রচুর ।

১৭

প্রথমদিকে রাঢ়ের রাজারা প্রজাদের কাছ থেকে শুধুমাত্র অল্প কিছু জিনিষপত্র উপঢৌকন নিতেন। কেউ শস্য দিত, কেউ হয়ত দিত দু'একটা কাপড়, কেউবা কিছু খাদ্যদ্রব্য বা ব্যবহার্য জিনিষপত্র। বছরে একগাছি ঝাঁটা দিত এমন প্রজাও ছিল। কোন প্রজা হয়ত রাজার বাড়ীতে বা খামারে বছরে দু-একদিন বেগার দিয়ে আসত। নগদে রাজস্ব দেবার প্রথা বিশেষ প্রচলিত ছিল না। কিন্তু রাজাদের ক্রিয়াকান্ড, উৎসব-অনুষ্ঠান, দুর্গ, প্রাসাদ, মন্দির নির্মাণ এইসব বাড়তে থাকলে সামান্য উপঢৌকনে বা দুই এক দিনের বেগারে আর কুলাত না। রাজার দাবীর পরিমাণ বাড়তে লাগল। উপরন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে রাজা জিনিষের পরিবর্তে প্রাপ্য ধার্য করতে লাগলেন নগদে। ফলে আর্থিক ব্যবস্থা যেমন বদলে যেতে লাগল তেমনি বদলাতে লাগল রাজা প্রজার সম্পর্ক।

নতুন আর্থিক ব্যবস্থা অনুসারে কর আদায় করা, জমি জমার বিলিব্যবস্থা করা, হিসাব-নিকাশ রাখা, বিভিন্ন নিষ্কর জমি বন্টনের ব্যবস্থা করা, মন্দির, প্রাসাদ, দুর্গ প্রভৃতি তৈরীর বন্দোবস্ত করা এ সবের জন্য দপ্তর ও রাজকর্মচারীর সংখ্যা না বাড়িয়ে উপায় ছিল না। কর্মচারীর সংখ্যা বাড়লে প্রশাসনের ব্যয়ও বাড়বে। ব্যয়বাহুল্যের এও আর এক কারণ। সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কর্মচারী ও সভাসদদের ভরণ-পোষণের জন্য ছোটনাগপুরের রাজা মুঘলদের অনুকরণে জাগীর প্রথার প্রবর্তন করলেন এবং খুঁটকাটি-গ্রাম সমূহ জাগীর হিসাবে দিতে আরম্ভ করলেন। জাগীরদাররা খুঁটকাটি-গ্রামের ওপর নিজেদের স্বত্ব প্রতিষ্ঠা করে প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করতে লাগলেন। স্বভাবতই জমির ওপর প্রজার স্বত্ব সংকুচিত হতে থাকল এবং খুঁটকাটিদারদের অধিকার ব্যাহত হ'ল।

১৮

যে সব গুরু, পুরোহিত, ব্রাহ্মণপন্ডিত, সাধু মোহন্তদের মাধ্যমে রাঢ়ে স্মার্ত-পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রসার লাভ করছিল এবং লৌহ সংস্কৃতির সংস্কার হচ্ছিল তাঁদের বেশীর ভাগই বাইরের লোক। রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে রাঢ়ে এসেছিলেন উৎকল ব্রাহ্মণরা, বাঙ্গালী রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র ও বৈদিক ব্রাহ্মণরা এবং জ্যোতিষবিদ্যায় পারদর্শী আচার্য ব্রাহ্মণরা। পশ্চিম থেকে

এসেছিলেন কনৌজিয়া ব্রাহ্মণরা। রাঢ়ে বৈষ্ণব মত প্রচার আরম্ভ করেছিলেন শ্যামানন্দ ও রসিক মুরারি। এঁরা দুজনে স্থানীয় লোক। কিন্তু রাঢ়ে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারকদের অধিকাংশই বাইরের লোক। এঁরা এসেছিলেন বাংলা, বিহার বা ওড়িশা থেকে। শিখরভূমের রাজাকে যিনি বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা দেন তাঁর বাসভূমি তো ছিল তামিলনাড়ে।

রাজাদের প্রশাসন বিস্তারের ফলেও বাইরে থেকে উচ্চজাতের হিন্দুরা আসতে সুরু করলেন। রাজাদের প্রশাসন যখন সরল ছিল তখন কাজকর্ম চলত রাজার সঙ্গে গ্রাম প্রধান বা অন্যান্য প্রভাবশালী লোকের রাজনৈতিক সাযুজ্যের ভিত্তিতে। গ্রামাঞ্চলে এঁদের প্রভাব প্রতিপত্তি মেনে নিয়ে শাসনকার্য পরিচালনা ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য রাজা এঁদের তরফ সর্দার, সর্দার ঘাটোয়াল, সীমানাদার প্রভৃতি পদে নিযুক্ত করতেন। এইসব পদাধিকারীরা ভরণ-পোষণের জন্য রাজার কাছ থেকে যৎসামান্য খাজনায় / (যেমন পঞ্চকী) বন্দোবস্ত দেওয়া জমি পেতেন। পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারে রাজার সঙ্গে এঁদের ব্যবস্থাটা হ'ত মৌখিকভাবে। কিন্তু প্রশাসনের বিস্তার ও দপ্তরের কাজ বাড়লে বাইরে থেকে লোক আনাতে হ'ল। কারণ দপ্তরের কাজ জানা যোগ্য লোক রাঢ়ে বেশী পাবার সম্ভাবনা ছিল না। আবার প্রশাসন বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আদব-কায়দা ও নানান সহবৎ প্রচলিত হয়েছিল। তার জন্যেও বাইরে থেকে লোক আনা প্রয়োজন হয়। এই সূত্রে এলেন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, ওড়িয়া ব্রাহ্মণ, করণ প্রভৃতি।

বিভিন্ন সূত্রে আসা বহিরাগত লোকেরা রাজার অনুগ্রহে ভূ-সম্পত্তি ও মধ্যস্বত্বাধিকার পেয়ে রাঢ়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। কিন্তু রাঢ়ী জনজীবনের সঙ্গে এঁদের মিলন-মিশ্রন অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। স্থানীয় লোকের পর্যায় থেকে বহিরাগতদের অবস্থান একটু দূরে; জীবনযাত্রাও কিছুটা সুতন্ত্র। আবার মধ্যবর্তী পর্যায়ের আর্থিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতাও এঁদেরই করায়ত্ত। জাতিগত মর্যাদায়, শিক্ষা-সহবতে এরা স্থানীয় লোকের তুলনায় উন্নত। এইসব কারণেই বোধহয় বহিরাগত উচ্চজাতির হিন্দুরা স্থানীয় অধিবাসীদের খানিকটা অবজ্ঞার চোখে দেখতেন। রাঢ়ের উচ্চজাতির মুখে রাঢ়ী-চুয়াড় কথাটা তারই প্রমাণ।

S/840
C-1
Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

১১

রাজার সাংস্কৃতিক সংস্কার প্রচেষ্টা ও প্রশাসন বিস্তারের ফলে আগেকার আর্থিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা ক্ষয় হতে থাকলে প্রজার অবস্থা যে ক্রমেই অবনতির দিকে যাবে একথা বুঝতে অসুবিধা হয় না। দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন পরিবর্তনের প্রভাবে ভূমির ওপর প্রজার প্রথাসিদ্ধ অধিকার ক্ষীয়মান। তার ওপর উদ্বৃত্তের প্রায় সবটুকুই রাজা, রাজকর্মচারী বা রাজার অনুগ্রহ-ভাজনদের প্রাপ্য বলে পরিগণিত। ক্ষতিগ্রস্থ ও বঞ্চিত হওয়া সত্ত্বেও প্রজারা অনেকেই নতুন ব্যবস্থা মেনে নিয়েছিল। কিন্তু সবাই নিতে পারেনি। ছোটনাগপুর রাজ্যে জাগীর প্রথা প্রবর্তিত হ'লে হেসা গ্রামের গাসি মুন্ডা নামে একজন খুঁটকাটিদার গ্রাম ছেড়ে চলে যায় এবং গভীর জঙ্গলের মধ্যে নতুন খুঁটকাটিগ্রামের পত্তন করে। ভূমিস্বত্বের সঙ্কোচন বা অন্যবিধ উৎপীড়নের ফলে গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়া ও নতুন বসতিস্থাপনের কাহিনী রাঢ়ে আরও শোনা যায়।

আগেকার বাস তুলে দিয়ে নতুন জায়গায় বসতিস্থাপন করা/বেশী ক্ষেত্রে সম্ভব হয়েছিল অবশ্য খুব বলে মনে হয় না। নতুন চাষের জন্য হাসিল করা যায় এমন জমি কাছাকাছি জায়গায় কমে আসছিল। তারপর হিন্দুসমাজের মধ্যে থেকে গ্রামবাসীরা বিভিন্ন জাতির পারস্পরিক নির্ভরশীলতা-ভিত্তিক যে আর্থিক ও সামাজিক ব্যবস্থার অঙ্গীভূত হয়েছিল তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া সহজ ছিল না। রাজা বিভিন্ন ধরনের নতুন ব্যবস্থার প্রচলন করছিলেন। তার কিছুটা হয়ত রাজার নিজস্ব প্রয়োজনেই। কিন্তু সবটা তা নয়। স্মার্ত-পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যবাদ অনুযায়ী সমাজ সংস্কার বা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম প্রসারের জন্যে রাজারা যা কিছু করছিলেন তাতে সাধারণ লোকের সম্মতি থাকা সম্ভব। স্মার্ত-পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাব সমাজের নিম্নকোটীর মধ্যেও ব্যপ্ত হয়েছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব তো নিম্নকোটীর মধ্যে আরও বেশী। তাই মন্দির স্থাপন, দেবসেবা, উৎসব-অনুষ্ঠানের আয়োজন, গুরু, পুরোহিত, ব্রাহ্মণ পন্ডিত, সাধু, মোহন্তর ভরণপোষণ রাজার সামাজিক কর্তব্য বলেই গণ্য হ'ত। দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর, বৈষ্ণবোত্তর ভূমির পরিমাণ হওয়া সত্ত্বেও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবার ফলে ক্ষতিগ্রস্থ/সাধারণ লোকে এগুলোকে অপ্রয়োজনীয় বা বাইরের উৎপাত বলে মনে করে নি। এ ছাড়াও রাজার কার্যকলাপের ফলে প্রজার ওপর চাপ ক্রমশ বাড়ছিল।

কিন্তু এইসব পরিবর্তন সত্ত্বেও রাজা ও প্রজার মধ্যে সামাজিক বন্ধন অবিচ্ছিন্ন থেকেছে। লক্ষ্যনীয়, চাপ ক্রমশ বাড়া সত্ত্বেও মুঘল আমলে রাঢ়ে কোন বড় প্রজাবিদ্রোহের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে না।

২০

অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রের তুলনায় সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে হিন্দুসমাজ অনেক বেশী সহিষ্ণু ও সামঞ্জস্যপরায়ণ। হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত হবার পরেও আদিবাসী কৌম জনগোষ্ঠী নিজেদের বিশ্বাস, পদ্ধতি, রীতি-নীতি, আচার-আচরণ বজায় রাখতে পারত। তবে কালক্রমে হিন্দুসংস্কৃতির প্রভাবে এগুলো ক্রমশ পরিবর্তিত হয়েছে। হিন্দুসমাজের প্রান্তবর্তী কৌম জনগোষ্ঠীসমূহ হিন্দুসাংস্কৃতিক উপাদান সরাসরি নিয়ে নিয়েছে এমন দৃষ্টান্তও প্রচুর। অপরপক্ষে হিন্দুসমাজও কৌম সাংস্কৃতিক উপাদান আত্মসাৎ করে নিয়েছে। পারস্পরিক দেওয়া-নেওয়ার মধ্য দিয়ে আদিবাসী কৌম জনগোষ্ঠী হিন্দুসংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। হিন্দুসমাজের মধ্যে থেকে প্রান্তবর্তী জনগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক সমন্বয় প্রক্রিয়ার অঙ্গীভূত হয়ে যাবে এটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু পর্যালোচনা করলে সমন্বয় প্রক্রিয়ার মধ্যেও প্রান্তবর্তী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে হিন্দুসমাজের বিরোধ-বিসম্বাদের ইঙ্গিত চোখে পড়বে। প্রান্তবর্তী জনগোষ্ঠীর দিক থেকে প্রতিরোধের দৃষ্টান্তও দুর্লভ নয়। একটা লোককথা বলে প্রসঙ্গটা শুরু করছি। কাহিনীটি ধলভূম, (সিংভূম জেলা, বিহার) রাজবংশের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রংকিনীকে নিয়ে।

পুরুলিয়া জেলায় পারা নামে একটা গ্রাম আছে। গ্রামটির মধ্যে উদয়চন্ডী মন্দিরের কাছে একটা বড় মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ মাটির টিবিতে চাপা পড়ে আছে। ধ্বংসস্তূপের মধ্যে কয়েকটি ক্রমহ্রস্বায়মান পরিধিবিশিষ্ট পাথরের স্তম্ভ ও দুটো ছোট স্তম্ভ দেখতে পাওয়া যায়। স্থানীয় লোকেরা বলেন ছোট স্তম্ভ দুটো ছিল রংকিনীর ঢেঁকির কাতলা, আর টিবির নীচে যে স্তম্ভটা পড়ে আছে, সেটা ছিল ঢেঁকির গাছ। ধলভূমের রংকিনী না কি আগে পারাতে থাকতেন। মানুষের মাংস না হ'লে তাঁর চলত না। মানুষ ধরে রংকিনী ওই ঢেঁকিতে ছেঁচে খেতেন।

পারার রাজার সঙ্গে রংকিনীর ব্যবস্থা হয়েছিল রোজ একটা করে মানুষ তাঁর কাছে পাঠান হ'বে। একদিন এক বাগাল গরু চরিয়ে সন্ধ্যাবেলা ঘনিবাড়ী এসে দেখে ঘনিব আর ঘনিবান দুজনেই হাপুস নয়নে কাঁদছে। বাগাল জিজ্ঞাসা করে জানতে পারল সেদিন ওই বাড়ীতে রংকিনীর পালা পড়েছে, একজনকে যেতে হবে। বাগালের গায়ে খুব জোর, আর মনে খুব সাহস। সে বলল, "তোমরা কেঁদো না, আমি যাব। এখন চট করে আমাকে একমুঠো মটর দানা আর একমুঠো লোহার মটর দানা এনে দাও"। মটর দানা ও লোহার মটর দানা কাপড়ে বেঁধে, দুটো কুকুর সঙ্গে নিয়ে বাগাল রংকিনীর মন্দিরে গিয়ে বসে রইল। রংকিনী এসে যেমনি তাকে ধরতে যাবেন বাগাল চেঁচিয়ে বলল, "দাঁড়াও! তুমি আমাকে ধরে খাবে কি আমি তোমাকে খাব। কিন্তু তার আগে দেখি কার জোর বেশী। এই দেখ মটর দানা। তুমি একমুঠো খাও, আর আমি একমুঠো খাই। যদি তুমি আগে শেষ করতে পার তবে তুমি আমাকে খেয়ে ফেলবে। আর আমি আগে শেষ করলে তোমায় ধরে খাব।" রংকিনী বললেন "আচ্ছা তাই হবে"। বাগাল তখন লোহার মটর রংকিনীকে দিয়ে নিজে আসল মটর দানা মুখে পুরল। রংকিনী লোহার মটর মুখে দিয়ে চিবাতেই পারছেন না। এদিকে বাগালের তো খাওয়া শেষ। বাগাল তখন রংকিনীকে ধরে আর কি। রংকিনী তো ভয় পেয়ে দৌড়তে লাগলেন। বাগাল তার কুকুর দুটো নিয়ে রংকিনীর পেছনে ছুটল। ছুটতে ছুটতে রংকিনী ধলভূমে এসে পড়লেন। সেখানে নদীর ধারে এক ধোপা কাপড় কাচছিল। রংকিনী তাকে বললেন, "আমাকে তুমি বাঁচাও। তোমাকে আমি রাজা করে দেব"। ধোপা তখন রংকিনীকে তার পাটের নীচে লুকিয়ে রাখল। এদিকে বাগাল এসে আর খুঁজে পায় না। শেষে রংকিনীকে না পেয়ে বাগাল ফিরে যাচ্ছিল। কিন্তু পথের মধ্যেই বাগালের জঙ্গলে সে আর কুকুর দুটো পাথর হয়ে গেল। এদিকে রংকিনীর প্রসাদে ওই ধোপা হ'ল ধলভূমের রাজা। রংকিনী হলেন ধলভূম রাজবংশের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। রংকিনীর মন্দির তৈরী হ'ল মহুলিয়া গ্রামে।

ধলভূমে রংকিনীর প্রতিপত্তি খুব। ধলভূমের বাইরেও রংকিনীর পূজা প্রচলিত, বিশেষ করে ছোটনাগপুরে।

মেদিনীপুর জেলায় ঝাড়গ্রাম মহকুমার শিলদার কাছে ওড়গোঁদা গ্রাম ও তার পাশে বিড়িডাঙ্গাতে কয়েকটি প্রাচীন নাগর মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। বিড়িডাঙ্গায় মহামণ্ডপ-বিশিষ্ট দুটো পাথরের মন্দির ও দীঘি নিয়ে একটা মন্দিরসংস্থান ছিল। ধ্বংসাবশেষ দেখে মনে হয় মন্দির দুটো নবম-দশম শতকে তৈরী হয়েছিল। দুটো মন্দিরেরই আচ্ছাদন ও দেওয়াল ভেঙ্গে পড়েছে ; গাঁথনি রয়েছে শুধু মেঝে পর্যন্ত। কোন দেবতার পূজো হ'ত তাও জানা যায় না। একটা মন্দিরের মেঝের ওপর ভৈরবকিশোর নামে এক লৌকিক দেবতা অধিষ্ঠিত আছেন। উলটানো জালার মত একটা পাত্রের ওপর অত্যন্ত আদিমদর্শন মুখ বসিয়ে ভৈরবকিশোরের মূর্তি গঠিত। নিম্নকোটীভুক্ত হিন্দুরা ভৈরবকিশোরের ভক্ত। পুরোহিতও ওই পর্যায়ের পাহান জাতির লোক। ভৈরবকিশোরের শক্তি ধলভূমের রংকিনী। বিড়িডাঙ্গার মন্দিরের সঙ্গে না কি রংকিনীর মন্দিরের সুড়ঙ্গপথে যোগাযোগ আছে। সকলের অগোচরে ভৈরবকিশোর রংকিনীর মন্দিরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে মিলিত হন। ওই পথেই রংকিনী আসেন বিড়িডাঙ্গায় ধলভূমে বেঁধা পরব শেষ করে রংকিনী বিড়িডাঙ্গায় আসেন। তারপর হয় বিড়িডাঙ্গার বেঁধা পরব।

পারা গ্রামে এখন তিনটি মন্দির আছে : মন্দিরগুলো উদয়চণ্ডী, লক্ষ্মী ও রাধারমনের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। এছাড়া একটা প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষও রয়েছে। উদয়চণ্ডী মন্দিরটি নাগর মন্দির। আনুমানিক দশম শতকে গঠিত মন্দিরটি বাংলার আঞ্চলিক নাগর মন্দির স্থাপত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। লক্ষ্মী মন্দিরটিও নাগর রীতির। তবে আনুমানিক পঞ্চদশ শতকীয় মন্দিরটিতে নাগর মন্দির স্থাপত্যকলার অবনতির লক্ষণ দৃষ্টিগোচর। রাধারমণ মন্দিরের নির্মাণকাল সম্ভবত: সপ্তদশ শতক। রাধারমণ মন্দিরের স্থাপত্যে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য কিছু নাই কিন্তু মন্দিরটি রাঢ়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের সঙ্গে জড়িত। শোনা যায় মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাতা পুরুষোত্তমদাস বৃন্দাবন থেকে পারাতে এসেছিলেন এবং এখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করেন।

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো থেকে মনে হয় পারা এলাকার হিন্দুসমাজ ও সংস্কৃতি অন্তত: নবম-দশম শতক থেকে দৃঢ়মূল হয়ে উঠেছে। এই পরিবেশে রংকিনীর মত নরমাংসলোলুপ ... কৌম দেবতা হয়ত আদি বৈশিষ্ট্য নিয়ে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারেনি। জয়চণ্ডী, গড়চণ্ডী,

মেলাইচন্ডী, বিশালাক্ষী এবং সর্বমঙ্গলাও আদিতে কৌম দেবতা । কালীও হয়ত তাই । অনেক জায়গাতেই তো শোনা যায় এঁদের মত দেবতারা নররক্ত ভিন্ন প্রসন্ন হন না । কালী বা অন্যান্য শক্তিরূপিনী দেবতার তুষ্টির জন্য অনেক জায়গাতেই নরবলি দেওয়া হ'ত । তবুও কিন্তু সামঞ্জস্য এবং রূপান্তরের পথে এঁদের ব্রাহ্মণ্যকরণ হয়েছে । রংকিনীর ক্ষেত্রে কোন কারণে হয়ত সেটা সম্ভব হয় নি । হিন্দুসংস্কৃতির সঙ্গে সংঘাতের ফলে রংকিনীর মত আদিম দেবতাকে নিজের জায়গা থেকে পিছিয়ে যেতে হয়েছে । পারা বা তার সন্নিহিত এলাকায় রংকিনীর পূজা এখন হয় না । রংকিনীর স্মৃতি এখানে লোককথার মধ্যেই আবদ্ধ ।

পারা থেকে রংকিনীর বিতাড়নে বাগালের (রাখালের) ভূমিকার তাৎপর্যও উল্লেখযোগ্য । পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জায়গায় অনাদি লিঙ্গ শিবের আবির্ভাব নিয়ে একটা কাহিনী প্রচলিত আছে । তারকেশ্বরের তারকনাথ শিবের প্রসঙ্গে এ কাহিনী অনেকেরই জানা । অনাদি লিঙ্গ শিবের আবির্ভাবের সঙ্গে বন হাসিল করে নতুন বসতি ও চাষ-বাস পত্তনের ব্যাপার অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত । সমস্ত ঘটনার নায়ক একজন গোয়ালা । অনাদি লিঙ্গ শিব ছিলেন বনের ভিতর, মাটির নীচে । কেউ জানত না । সেই বনের কাছে এক গোয়ালার গরু চরত । গোয়ালা দেখে একটা গাই আর দুধ দেয় না । কি হচ্ছে দেখবার জন্য সে গাইটার পেছনে পেছনে বনের মধ্যে গিয়ে দেখে যে তার গাই একজায়গায় মাটির ওপরে (কোন কোন কাহিনীতে আছে একখন্ড পাথরের ওপরে) দুধ দিচ্ছে । গোয়ালা সেই জায়গা খুঁড়ে একটা পাথর পেল । তখন মহাদেব তাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন যে পাথরটা সামান্য পাথর নয়, ওটা শিবলিঙ্গ । তুমি ওর পূজা কর । গোয়ালা সেই থেকে ওই পাথরে শিবের পূজা আরম্ভ করল । তারপর শিবের মাহাত্ম্যে বনের জায়গায় হ'ল বসত আর বসতি ঘিরে হ'ল চাষ-বাস ।

স্থায়ী বসতিসম্পন্ন সমাজের প্রসারে বোধহয় গোপালক গোপরাই ছিল অগ্রবর্তী ভূমিকায় । অনাদি লিঙ্গ শিবের যে কাহিনী বললাম তার ইঙ্গিত এইটাই । অনুমান হয়, রাঢ়ের অনেক জায়গাতেই স্থায়ী বসতিসম্পন্ন সমাজের প্রসার আরম্ভ হয়েছে গোপদের উদ্যোগে । রাঢ়ের বিভিন্ন জায়গায় গোপরাজাদের যে সব রাজ্য দেখতে পাওয়া যায় সেগুলো সম্ভবত: এরই স্বাভাবিক পরিণতি । রাঢ়ের ক্ষত্রিয় পরিচয় প্রত্যাশী রাজবংশগুলোর উদ্ভব নিয়ে যে সব কাহিনী প্রচলিত

আছে একটু আগে তার উল্লেখ করেছি । এর কতকগুলো গল্পে দেখা যায় রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা যখন অসহায় অবস্থায় এক ব্রাহ্মণের আশ্রয়ে ছিলেন তখন তাঁর কাজ ছিল ওই ব্রাহ্মণের গরু চরানো । পারার কাহিনীতেও দেখছি রংকিনীকে কৌশলে এবং ভয় দেখিয়ে তাড়াল এক বাগান । তার ভয়ে রংকিনী ছুটতে ছুটতে চলে গেলেন ধলভূম পর্যন্ত । এখানে কিন্তু একটা ব্যাপার লক্ষ করতে হবে । ধলভূমে এসে বাগানের শক্তি বা কৌশল কোনটাই সঙ্গে লাগল না । ধোপার পাটের নীচে রংকিনীকে সে খুঁজেই পেল না । তারপর ফিরে যাবার পথে সে আর তার কুকুর দুটোও পাথর হয়ে গেল !

বিড়িডাঙ্গা ধলভূম থেকে বিশেষ দূরে নয় । এখানে একটি প্রাচীন নাগর মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের ওপর রংকিনীর ভৈরব অধিষ্ঠিত রয়েছেন । বিড়িডাঙ্গায় এলে রংকিনী স্বয়ং অবস্থান করেন ভৈরবের সম্মুখবর্তী আর একটা নাগর মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের ওপর । ধলভূমে বাগানের যে পরিণতি হ'ল তার সঙ্গে প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের ওপর আদিম দেবতার অধিষ্ঠানের ঘটনা মিলিয়ে দেখলে হিন্দু সংস্কৃতি ও ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রতি আদিবাসী কৌম জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধ মনোভাবের, এমন কি প্রতিরোধের ইঙ্গিতও পাওয়া যাবে ।

বিড়িডাঙ্গার মত আরও কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ লৌকিক বা কৌম দেবতার অধিষ্ঠানক্ষেত্রে রূপান্তরিত হয়েছে । দু'একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে । পুরুলিয়া জেলার দেউলি গ্রামে নাগর রীতির একটি প্রাচীন পঞ্চায়তন মন্দিরসংস্থান আছে । মূল মন্দিরটি এখন ভগ্নদশাপন্ন ; আচ্ছাদনের বেশীর ভাগই ভেঙে পড়েছে । মন্দিরটির গর্ভগৃহে এখন লৌকিক দেবতা ভৈরব পূজিত হচ্ছেন । বাঁকুড়া জেলার হাড়মাসড়া গ্রামেও একটা পুরানো নাগর মন্দির আছে । মন্দিরটিতে দেবপ্রতিমা নেই । হাড়ি জাতির এক পুরোহিত এখানে জনৈক সন্ন্যাসী ঠাকুরের পূজা করেন । নাগছত্রবিশিষ্ট জৈন মূর্তিকে মনসা বলে পূজা করা বা দিগম্বর জৈন মূর্তিকে ভৈরব বলে পূজা করবার দৃষ্টান্ত প্রচুর ।

২১

হিন্দু সমাজের মধ্যে প্রান্তবর্তী জনগোষ্ঠীর অবস্থা বোঝার প্রশ্নে পারা, ধলভূম, বিড়িডাঙ্গা, দেউলি, হাড়মাসড়ার মত দৃষ্টান্তগুলোর গুরুত্ব উপেক্ষা করা যায় না। হিন্দু সমাজের উন্নততর ব্যবস্থা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসবার পরেও এবং হিন্দু সংস্কৃতির সহিষ্ণুতা ও সামঞ্জস্যপরায়ণতা সত্ত্বেও এই ধরনের ঘটনা ঘটছে। ধলভূমের রংকিনীর পূজা এখন স্মার্ত-পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যবাদ দ্বারা প্রভাবিত। দেবীর পূজার জন্য সংস্কৃত মন্ত্রও ব্যবহার করা হয়। পূজা করেন উৎকল ব্রাহ্মণ। কিন্তু পারা থেকে দেবীর ধলভূমে আগমন ও প্রতিষ্ঠালাভের কাহিনীর মধ্যে হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে আদিবাসী কৌম সংস্কৃতির বিরোধের আভাস সুস্পষ্ট। হিন্দুসমাজ ও সংস্কৃতি যেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত সেখানে বিরোধের ফলে আদিবাসী কৌম সংস্কৃতি পশ্চাদপসারণ করেছে। রংকিনী পারা ছেড়ে চলে এসেছেন ধলভূমে। এই প্রসঙ্গে গাসি মুন্ডার কথাও স্মরণ করা যেতে পারে। গাসি মুন্ডা গ্রাম ছেড়ে গভীর অরণ্যে চলে গিয়ে পুরাতন প্রথা অনুসারে খুঁটকাটি গ্রামের পত্তন করেছিল। হিন্দুসমাজ ব্যবস্থার প্রভাবে যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল তার মধ্যে থেকে প্রান্তবর্তী জনগোষ্ঠীর পক্ষে হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত হওয়া বা প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল না। তাছাড়া হিন্দু সংস্কৃতির সহিষ্ণুতা ও সামঞ্জস্যপরায়ণতা এতটাই যে বিরোধের অবকাশও হয়ত কমই ছিল। প্রান্তবর্তী জনগোষ্ঠী অনেকক্ষেত্রেই স্বেচ্ছায় হিন্দু সংস্কৃতি গ্রহণ করেছে, অথবা অবস্থা বিশেষে মেনে নিয়েছে। কালক্রমে তারা সবাই সাংস্কৃতিক রূপান্তর ঘটাবার চেষ্টা করেছে হিন্দু সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করে। কিন্তু হিন্দু সংস্কৃতি প্রতিরোধের ইচ্ছা বা হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাববলয়ের মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠার বাসনা প্রান্তবর্তী জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্পূর্ণ লোপ পায়নি। সামঞ্জস্যের ভিত্তি শিথিল হলে প্রান্তবর্তী জনগোষ্ঠীর আদিম সংস্কৃতি যতদূর সম্ভব স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে ওপরে উঠে আসবার চেষ্টা করেছে। প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে কৌম দেবতার থান প্রতিষ্ঠা এই প্রবণতার নিদর্শন বলে ধরা যেতে পারে। বিড়িডাঙ্গা, দেউলি, হাড়মাসড়ায় উন্নততর সংস্কৃতির অবশেষ লৌকিক বা কৌম সংস্কৃতি দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। প্রাচীন নাগর মন্দিরের পরিচয় এখন লৌকিক দেবতার থান বলে।

২২

রাঢ়ের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে হিন্দুসমাজের সঙ্গে কৌম জনগোষ্ঠীসমূহের সংশ্লেষের ফলে। তাই রাঢ়ের জনজীবনে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী আবর্তিত হয়েছে প্রধানত: হিন্দুসমাজের সঙ্গে কৌম জনগোষ্ঠীসমূহের সম্পর্ক কেন্দ্র করে। সর্তাধীন সহাবস্থান ও সামঞ্জস্য হিন্দুসমাজের দিক থেকে সম্পর্ক নির্ণয়ের মূলসূত্র। হিন্দুসমাজ প্রান্তবর্তী জনগোষ্ঠীকে অঙ্গীভূত করে নেবার চেষ্টা করেছে এই সূত্র অবলম্বন করে। হিন্দুসমাজের বর্ণ-জাতিভিত্তিক শ্রমবিভাগ ও উচ্চনীচ ভেদ মেনে নেবার পর কৌম জনগোষ্ঠীসমূহ হিন্দুসমাজের প্রান্তে আশ্রয় পেয়েছে। এখানে তাদের স্থান নিম্নতম পর্যায়ের জাতি হিসাবে। বিভিন্ন সময়ে ভারতের বহু আদিবাসী কৌমগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এই রূপান্তর ঘটেছে। অনেক উপজাতির ক্ষেত্রে আবার এই রূপান্তর বিলম্বিত হয়েছে অথবা ঘটেইনি। হিন্দুসমাজ থেকে দূরত্বের পরিসর হয়ত কোন কোন ক্ষেত্রে এর কারণ। কিন্তু রাঢ়ে হিন্দুসমাজের অনুপ্রবেশ এবং/প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার প্রায় অনিবার্য ছিল বলা যায়। রাঢ়ের আশে-পাশে চারদিক ঘিরে স্থায়ীবসতিসম্পন্ন হিন্দুসমাজের অবস্থান। উপরন্তু রাঢ় ধাতুর উৎস।

হিন্দুসমাজের প্রভাবে আদিবাসীদের উৎপাদন ব্যবস্থা, রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও সামাজিক পরিবেশ পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়েছে। এর ফলে কৌম সমাজ ধ্বংস হয়েছে। কিন্তু কৌম ঐতিহ্য, বিশেষ করে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, লোপ পায় নি। অপরদিকে হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত হবার পর প্রান্তবর্তী জনগোষ্ঠী হিন্দু ব্যবস্থার সুযোগ-সুবিধাগুলো পেয়েছে। নবাগত কৌম জনগোষ্ঠী স্থান পেয়েছে হিন্দুসমাজের প্রান্তদেশে, নিম্নতম পর্যায়ের জাতি হিসাবে। হিন্দুসমাজে প্রত্যেক জাতির বৃত্তি নির্দিষ্ট। নিম্নতম পর্যায়ের জাতিও এই সুযোগের পূর্ণ অধিকারী। নিয়ম অনুসারে তার বৃত্তির ওপর কেউ হাত দিতে পারে না। কারণ, হিন্দুসমাজে বৃত্তির ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার কোন অবকাশ নেই। সামাজিক ক্ষেত্রে নিম্নতম পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হলেও কোন জাতি বা জাতির অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি চিরকালই যে নিম্নতম পর্যায়ে পড়ে থাকবে, এমন কথা নেই। পঞ্চদশ ষোড়শ শতক থেকে উদ্ভূত রাঢ়ের আদিবাসী রাজবংশগুলো সামাজিক বিবর্তনের প্রক্রিয়া অবলম্বন করে রাজপুত ও ক্ষত্রিয় বলে স্থানীয় সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। রাজারা ছাড়াও নিম্নতম জাতির

সম্পন্ন ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের অনেকেই তো স্থানীয় পর্যায়ে ক্ষত্রিয় বলে স্বীকৃত । সংস্কৃতির ক্ষেত্রে হিন্দুসমাজ কোন বাধ্যবাধকতা আরোপ করেনি ।

হিন্দুসমাজের প্রভাবে কৌম সমাজ ভেঙে গিয়েছিল বটে, কিন্তু তার পরিবর্তে যে ব্যবস্থার পত্তন হ'ল তাতেও এক ধরনের সামাজিক স্থায়ীত্ব ও নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি বিদ্যমান । নতুন ব্যবস্থার মধ্যে সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা রক্ষা করা যায় । আবার উচ্চতর সামাজিক মর্যাদাও অর্জন করা সম্ভব । রাঢ়ের মত জায়গায় যেখানে আধুনিক কালের আগে উৎপাদন বাড়বার সম্ভাবনা বিশেষ ছিল না, অর্থাৎ সম্পদ সীমিত, সেখানে উন্নততর হিন্দু সামাজিক ব্যবস্থা কৌম সমাজের লোকে যে মেনে নেবে এতে বিস্ময়কর কিছু নেই । কৌম সমাজের লোকে হিন্দু-সমাজের অন্তর্ভুক্ত হবার পর নতুন ব্যবস্থার কল্যাণে রাঢ়ে রাজ্য গড়ে উঠেছিল এবং সেই সঙ্গে সাংস্কৃতিক রূপান্তরের প্রক্রিয়াও দ্রুততর হয়েছিল ।

নতুন পরিবেশে কৌমসমাজের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের দৃঢ়বন্ধন শিথিল হয়ে গেল ঠিকই, কিন্তু বিভিন্ন জাতের পরস্পর নির্ভরশীল সামাজিক ব্যবস্থা এবং সকলের সাংস্কৃতিক রূপান্তরের আগ্রহ থেকে নতুন সম্প্রদায় চেতনায় সূত্রপাত হ'ল । প্রক্রিয়াটা রাঢ়ে এবং রাঢ়ের বাইরে অন্য কৌম গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে একই । কিন্তু রাঢ়ে দেখছি সম্প্রদায়ের চেতনা রাজ্য ভিত্তিক এবং রাজ্যের অধিপতি রাজা রয়েছেন সম্প্রদায়চেতনার কেন্দ্রস্থলে । সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ার সূত্রপাত হয়ত রাজ্য স্থাপনের আগেই হয়েছিল । কিন্তু হিন্দুসমাজে রূপান্তর প্রক্রিয়া চলে অত্যন্ত ধীরে, প্রায় অলক্ষিতে । নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে দেখতে চাইলে সেটা হয়ত চোখেই পড়বে না । উচ্চতর সামাজিক পরিচয়প্রত্যাশী রাজন্যবর্গের পক্ষে এই ধীরগামী প্রক্রিয়ার স্বাভাবিক পরিণতির জন্যে অপেক্ষা করে থাকা কঠিন । রাজারা তাই নিজেদের সহায়-সম্বলের সাহায্যে বিবর্তন প্রক্রিয়াটিকে স্পষ্টতর করে সংগঠিত সামাজিক আন্দোলনের রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন । রাজার প্রচেষ্টা স্বাভাবিক কারণেই তাঁর রাজ্যের মধ্যেই আবদ্ধ থেকেছে । অর্থাৎ বিভিন্ন রাজার সংগঠিত প্রচেষ্টা তাঁর রাজ্যের ব্যাপার, রাজ্যের অধিবাসীরাই তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ।

অনেক বীরভূম, গোপভূম, শিখরভূম, সামন্তভূম, মল্লভূম, বরাভূম, মানভূম, ধলভূম, ভঞ্জভূম প্রভৃতি নামধেয় রাজ্যগুলোর নাম উদ্ভূত হয়েছে রাজবংশের নাম (মানভূম, বীরভূম,

ধনভূম) বা রাজবংশের জাতি (গোপভূম, মল্লভূম) বা অন্যবিধ পরিচয় (সামন্তভূম) থেকে। কিছু কিন্তু ভূম এলাকাগুলো শুধু বিভিন্ন ভূখন্ডের রাজনৈতিক পরিচয়মাত্র নয়, এগুলো রাজ্যের অধিবাসীদের সম্প্রদায়গত পরিচয়সূচকও বটে। বিভিন্ন ভূমের অন্তর্ভুক্ত জনগোষ্ঠীসমূহ তাদের পূর্বতন কৌম পরিচয়ের সংকীর্ণ গন্ডী অতিক্রম করে বৃহত্তর সম্প্রদায়ে রূপ লাভ করেছে। ভূম এলাকার মধ্যে রাজার অধীনে বিভিন্ন কৌম জনগোষ্ঠীকে একত্রিত করে ব্যাপকতর ভিত্তিতে সম্প্রদায় গঠন হিন্দুসমাজের সঙ্গে কৌম সমাজের যে সংশ্লেষ ঘটেছিল তার একটা দিকের চূড়ান্ত পরিণতি। সম্প্রদায়ের জন্ম হয়েছে সামাজিক, রাজনৈতিক ও সংস্কৃতিক বিবর্তনের ধারাগুলো একত্রে সম্মিলিত হবার ফলে।

২৩

হিন্দুসমাজের প্রভাব অবশ্য সব কৌম জনগোষ্ঠীর ওপর সমভাবে কার্যকর হয়নি। হিন্দুসমাজের সঙ্গে সংশ্লেষের ফলে বিভিন্ন কৌম জনগোষ্ঠী বিবর্তিত হয়ে বাউড়ী, বাগ্দী, মাল, কুর্মী, ভূমিজ, লেট, খয়রা প্রভৃতি হিন্দু জাতিতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু হিন্দুসমাজের সংস্পর্শে থেকেও অনেক খন্ডজাতি/সমূহ দীর্ঘকাল তাদের স্বকীয় কৌম বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে। কোন কোন খন্ডজাতি তো স্থায়ী বসতি পর্যন্ত গড়ে তোলেনি বা তুলতে পারেনি। বীরহড়রা আর্থিক জীবনে হিন্দুসমাজের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত, এমন কি নির্ভরশীলও। তবুও তাদের একটা বড় অংশ যাযাবর জীবন যাপন করে। হিন্দু সংস্কৃতির ছাপও এদের ওপর তুলনায় বেশ কম। ওঁরাও ও সাঁওতালরা স্থায়ীভাবে গ্রামে বাস করে, চাষ-বাসও করে স্থায়ীভাবে। হিন্দুসমাজের সঙ্গে এদের লেন-দেন যথেষ্ট এবং দীর্ঘদিনেরও বটে। হিন্দু সাংস্কৃতিক প্রভাবের দৃষ্টান্তও এদের মধ্যে দুর্লভ নয়। কিন্তু এরা হিন্দুজাতি হিসাবে পরিগণিত হয় না। কিছুদিন আগে পর্যন্তও এরা নিজেদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সযত্নে রেখেছে।

হিন্দুসমাজ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হবার পরও পুরানো ব্যবস্থায় ফিরে যাবার দৃষ্টান্ত আছে। গাসি মুন্ডার কাহিনী এর দৃষ্টান্ত। সাংস্কৃতিকক্ষেত্রে সামঞ্জস্যের প্রশ্ন থাকা সত্ত্বেও হিন্দুসমাজের প্রান্তবর্তী জনগোষ্ঠীর মনে আদি কৌম সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণ প্রবলতর থাকতে পারে এর ইঙ্গিত পাওয়া যাবে ভগ্ন মন্দিরকে কৌম দেবতার থানে রূপান্তরিত করবার প্রচেষ্টায়।

২৪

হিন্দু সমাজের প্রভাবে কৌম সমাজের রূপান্তর রাঢ়ের ইতিহাসের একটা দিক। আর একটা দিকের পরিচয় পাওয়া যাবে হিন্দু সমাজের প্রভাব প্রতিরোধ করবার প্রচেষ্টায়। রাঢ়ে হিন্দু সমাজের প্রভাব গভীর এবং ব্যাপক। অধিকাংশ কৌম জনগোষ্ঠী হিন্দু সমাজের অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। এই পরিবেশের মধ্যে থেকেও যারা হিন্দু সমাজের প্রভাব থেকে সরে থাকতে পেরেছে বা হিন্দু সংস্কৃতির ওপর কৌম সংস্কৃতির স্মৃতি পুনরুজ্জীবিত করতে পেরেছে তাদের জীবনধারার মধ্যেই আদিবাসী কৌম সমাজের অন্তর্নিহিত শক্তি ও গতিবেগের সন্ধান মিলবে। হিন্দু সমাজের প্রভাবমণ্ডলের মধ্যেও কৌম সমাজের শক্তি ও বেগ একেবারে লুপ্ত হয়নি। রাঢ়ে হিন্দু সমাজের প্রান্তবর্তী জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত দিকটা লক্ষ্য করলেই এর পরিচয় পাওয়া যাবে। হিন্দু সমাজব্যবস্থার বন্ধনে শিথিল হয়ে গেলে কৌম সমাজের অন্তর্নিহিত শক্তি ও বেগ হিন্দু সমাজের প্রান্তবর্তী জনগোষ্ঠীর জীবনধারার ওপর কতটা প্রভাব বিস্তার করে এবং তার ফলে প্রান্তবর্তী জনগোষ্ঠীই বা কোন পথে অগ্রসর হয় সেটাই এখন লক্ষ করবার বিষয়।

...

গ্রন্থপঞ্জী

E.T. Dalton, Descriptive Ethnology of Bengal, Calcutta, 1872).

J.D. Beglar, "A Tour Through the Bengal Province", Report of the Archaeological Survey of India, 1872-73, Vol. VIII, (Calcutta, 1878).

V. Ball, Economic Geology, Manual of the Geology of India, Part III, (Calcutta, 1881).

H.H. Risley, The Tribes and Castes of Bengal, Vol. I, II, (London, 1891).

Sarat Ch. Ray, The Mundas and Their Country, (Calcutta, 1912).

- Do - , The Birhors, (Calcutta, 1925).

- Do - , Oraon Religion and Customs, (Calcutta, 1928).

Nirmal Kumar Bose, Culture and Society in India, (Bombay, 1967).

নির্মলকুমার বসু, হিন্দু সমাজের গড়ন (কলিকাতা, ১৯৪১)।

নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস, (কলিকাতা, ১৯৪১)।

গোপেন্দুকৃষ্ণ বসু, বাংলার লৌকিক দেবতা, (কলিকাতা, ১৯৬৬)।

নি.চ.

15. On the Scientific Study of Politics : A Review of the Positivisit Method *(The State of Political Theory : Some Marxist Essays.* Calcutta, Research India Publications, 1978)

PARTHA CHATTERJEE

6. Trade and Empire in Awadh, 1756-1804

RUDRANGSHU MUKHERJEE

7. The Ethnic and Social Bases of Indian Federalism

SHIBANI KINKAR CHAUBE

8. বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্রে যতিচিহ্নের ব্যবহার, ১৮১৮-১৮৫৮ (Use of Punctuation Marks in the Bengali Journalistic Prose, 1818-1858)

DEBES ROY

19. The Medieval Northeast India : Polity Society and Economy, 1200-1750 A.D. (forthcoming in *The Cambridge Economic History of India*, Vol. I)

AMALENDU GUHA

20. The Colonialist Premise in the British Occupation of Bengal : Contributions by Clive and Pitt, the Elder, during 1757-59 (*Proceedings of the Indian History Congress*, Bhubaneswar, 1977)

BARUN DE

21. Thinking About Ideology : In Search of an Analytical Framework

PARTHA CHATTERJEE

Material Conditions and Behavioural Aspects of Calcutta Working Class 1875-1899

RANAJIT DAS GUPTA

3. An Essay on John Rawls' Theory of Distributive Justice and its Relevance to the Third World

A. P. RAO

24. Impact of Plantations on the Agrarian Structure of the Brahmaputra Valley

KEYA DEB

25. Assamese Peasant Society in the late Nineteenth Century : Structure and Trend *(The Indian Economic and Social History Review*, Vol. XVII, No. 1)

AMALENDU GUHA

26. Of Trade and Traders in Seventeenth Century India : An Unpublished French Memoir by George Roques

INDRANI RAY

27. Pattern of Organisation in Handloom Industry of West Bengal (forthcoming in *Social Scientist*, Trivandrum)

ABANTI KUNDU

28. Foreign Technical Collaboration in Indian Business Houses, 1957-76 : A Quantitative Analysis *(Business Standard*, Annual Number, 1980)

SUBHENDU DASGUPTA

29. The Multiple Faces of the Early Indian Merchants

INDRANI RAY

30. Agrarian Relations and Politics in Bengal : Some Considerations on the Making of the Tenancy Act Amendment 1928

PARTHA CHATTERJEE

31. Cobb-Douglas Agricultural Production Functions : A Sceptical Note

N. KRISHNAJI

PROCEEDINGS OF CONFERENCES & SEMINARS :

1. Problems of the Economy and Planning in West Bengal (CSSSC, 1974)
2. Change and Choice in Indian Industry (in press)

PERSPECTIVES IN SOCIAL SCIENCES :

Volumes of essays on a common theme by scholars in the Centre to be periodically published :

1. Historical Dimensions (Calcutta, Oxford University Press, 1977)

MONOGRAPHS

Results of research work individually undertaken by the Centre's staff :

1. SUNIL MUNSI	:	Geography of Transportation in Eastern India under the British Raj. Calcutta, K. P. Bagchi & Co, 1980
2. NIRMALA BANERJEE	:	Demand for Electricity. Calcutta, K. P. Bagchi & Co., 1979
3. SOBHANLAL DATTA GUPTA	:	Comintern, India and the Colonial Question : 1920-1937. Calcutta, K. P. Bagchi & Co, 1980

PUBLIC LECTURES :

1. ASHOK MITRA	:	Terms of Exchange and Accumulation : The Soviet Debate (R. C. Dutt Lectures on Political Economy, 1975). Calcutta, Orient Longman, 1977
2. KRISHNA BHARADWAJ	:	Classical Political Economy and Rise to Dominance of Supply and Demand Theories (R. C. Dutt Lectures on Political Economy, 1976). Calcutta, Orient Longman, 1978
3. B. N. GANGULI	:	Some Aspects of Classical Political Ecnomy in the Nineteenth Century Indian Perspective (R. C. Dutt Lectures on Political Economy, 1977) Calcutta, Orient Longman, 1979
4. I. S. GULATI	:	International Monetary Development and the Third World : A Proposal to Redress the Imbalance (R. C. Dutt Lectures on Political Economy, 1978) in press
5. V. M. DANDEKAR	:	Peasant-Worker Alliance : Its Basis in the Indian Economy (R. C. Dutt Lectures on Political Economy, 1979) in press